গাউসে আলম

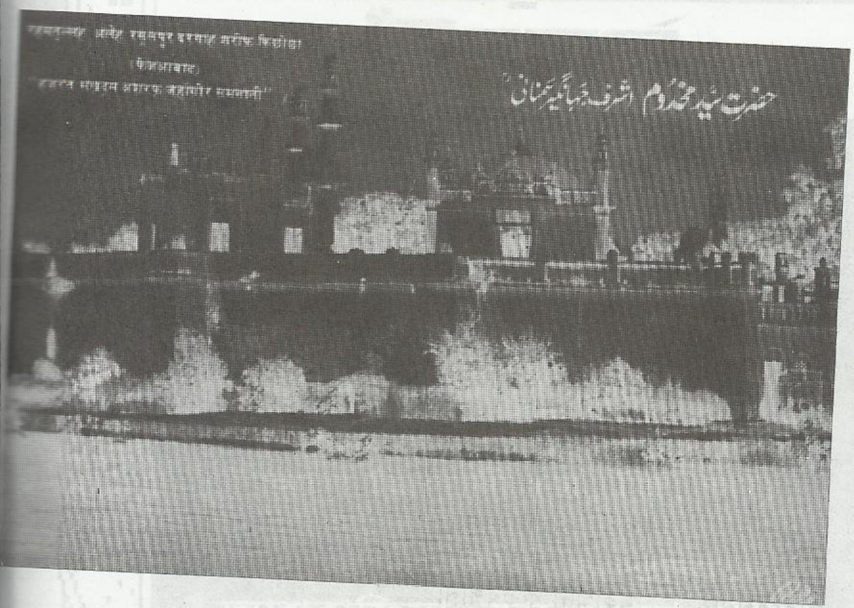
হযরত আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী (রাঃ)



আবু আহমদ জামেউল আখ্তার আশরাফী

গাউসে আলম
হযরত আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী

[রাহমাতুল্লাহে তায়ালা আলাইহে]



রওজা শরীফ/ হযরত আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী (রঃ)

আবু আহমদ জামেউল আখতার আশরাফী

আশরাফ জাহাঙ্গীর একাডেমী
চট্টগ্রাম।

আবু আহমদ জামেউল আখতার আশরাফী

প্রকাশনায়	:	(আলহাজ্ব) মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আশরাফী আশরাফ জাহাঙ্গীর একাডেমী, চট্টগ্রাম।
প্রকাশ	:	১লা নভেম্বর '৯৬ ইংরেজী
শব্দ বিন্যাস	:	সৈকত কম্পিউটার, দিদার মার্কেট, দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম
প্রচ্ছদ	:	মোহাম্মদ এয়াছিন
মুদ্রণ	:	ইসলামিয়া অফসেটপ্রেস
হাদিয়া	:	৪০ . ০০ টাকা মাত্র।
পরিবেশনায়	:	মুহাম্মদী কুতুবখানা ৪২, শাহী জামে মসজিদ মার্কেট (২য় তলা) আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। ফোন- ৬১৮৮৭৪

A Life sketch of **Gaus-e-Alam Hazrat Ashraf Jahangir Simnany** (R) by Abu Ahmad Jameul Akhtar Ashrafi in Bengali, & Published by Alhaj Mohammad Abdullah Ashrafi, Ashraf Jahangir Acadamy, Chittagong, Bangladesh.

Price: 40 Taka only

উৎসর্গ

প্রাণপ্রিয় মুর্শিদ

আওলাদে গাউসে আযম,
আশরাফুল মশায়েখ হযরতুল
আল্লামা আলহাজ্ব আবুল মাসউদ
সৈয়দ মুহাম্মদ মোখতার
আশরাফ আল্ আশরাফী
আল জিলানী (ম, জি, আ)

সাজ্জাদানশীন, আস্তানায়ে
আশরাফিয়া, কাচওয়াচা শরীফ
ফয়েজাবাদ, ভারত

যাঁর প্রেরণা ও রূহানী ফুয়ুজাত
আমাদের পাথেয়

প্রকাশকের কথা

(নাহমাদুহূ ওয়া নুসাল্লি আলা হাবীবিহিল করীম ওয়া আলা আলিহী ওয়া আসহাবিহী আজমায়ীন)

আল্লাহর অলিগণের জীবনী আলোচনা ও স্মরণের মধ্যে আল্লাহর করুণা ও রাহমত যেমন লাভ করা যায় তেমনি তাঁদের জীবনবোধ ও আদর্শ সামনে রেখে জীবন পরিচালনা করতে সচেষ্ট হওয়ার মধ্যে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতের সাফল্য, সম্মান ও মর্যাদা অর্জন অবধারিত। বিশ্ববিশ্রুত বুযর্গ ও ইমাম, গাউসে আলম, আওহাদুদ্দীন, মীর, সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানীর (রাঃ) মাহাত্মপূর্ণ জীবনের পরতে পরতে সাফল্যের সেসব উপাদান অজস্রভাবেই বিদ্যমান। সেজন্য বাংলা ভাষী ভাইবোনদের খেদমতে আমাদের এ গ্রন্থখানি প্রকাশ করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

গ্রন্থখানা অলি বুযর্গদের সম্পর্কে জানতে আগ্রহী পাঠককুলের কাছে গৃহীত হবে বলেই আশা রাখি।

এ গ্রন্থ প্রকাশে সংশ্লিষ্ট সবার কাছে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। বিশেষতঃ শ্রদ্ধেয় আলহাজ্ব মাসউদুর রহমান আশরাফীর উদার সহযোগিতার কথা উল্লেখ না করলেই নয়। আল্লাহ যেন সকলকে উত্তম প্রতিদান দেন!

পাঠক মহলের কাছে অনুরোধ রইল- কোন ভুল ত্রুটি চোখে পড়লে যেন অবহিত করেন।

আল্লাহ! সবার শ্রম কবুল করো! তোমার প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর বংশীয় মহান সৈয়দজাদাগণের অসিলায় আমাদেরকে সার্বিক সফলতা নসীব করো!

সালামান্তে

(আলহাজ্ব) মোহাম্মদ আবদুল্লাহ্ আশরাফী

দুটি কথা

((আলহামদুলিল্লাহে রাব্বিল আলামীন, ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসূলিহিল করীম ওয়া আলা আলিহী ওয়া আসহাবিহী আজমায়ীন))

এক অসাধারণ বিস্ময়কর পবিত্রতায় ভরা আদর্শ জীবন খুঁজে পাওয়া যায় আল্লাহর অন্যতম বুযর্গ মাহবুবে ইয়াযদানী, গাউসে আলম, তারেকুস সালতানাত, ইমামে তরীকত, মুজাদ্দেদে দ্বীন ও মিল্লাত, আওহাদুদ্দীন, মীর সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী (রাঃ)-এর মাহাত্মপূর্ণ জীবনের মাঝে। একজন ন্যায়পরায়ণ তরুণ যশস্বী সুলতান হওয়ার পরও পার্থিব জীবনের সর্বোচ্চ সম্মানীয় এ মুকুট অবলিলায় ত্যাগ করে কঠোর তাপস জীবনের মাঝে আত্মবিলীন হয়ে তিনি লাভ করেছিলেন বেলায়তের সর্বোচ্চ মুকুট গাউসিয়াত, তরীকতের আরাধ্য খেতাব মাহবুব, শরীয়তের অসাধারণ স্বীকৃতি মুজাদ্দেদ। এর উপর তাঁর রয়েছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বংশধর হবার জন্মগত সৌভাগ্যময় বৈশিষ্ট্য।

এ মহান বুযর্গ এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা তথা বিশ্বের সর্বত্র নিজ কর্মময় প্রদীপ্ত জীবনালোক দিয়ে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের সাথে সাথে তরীকতের নিবিড় অনুশীলনের পথে পথহারা মানুষকে টেনে তুলেছেন সার্থকতার সোনালী ডিঙ্গিতে।

এমন মহান ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে বাংলা ভাষায় এ জীবনী গ্রন্থ প্রকাশ হওয়ায় বাংলাভাষীরা নিঃসন্দেহে উপকৃত হবেন বলেই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

আল্লাহ যেন আমাদেরকে এ মহান বুযর্গের জীবনাদর্শ অনুসরণের তৌফিক দেন। আমিন! বেহুরমতে সাইয়েদিল মুরসালীন সালাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম।

(আলহাজ্ব) মোহাম্মদ মাসউদুর রহমান আশরাফী
সহ-সভাপতি, আশরাফ জাহাঙ্গীর একাডেমী,
চট্টগ্রাম।

প্রসংগ কথা

((মুবাসমেলাওঁ ওয়া হামেদাঁও ওয়া মুসাল্লিয়াঁও ওয়া মুসাল্লেমা))

পৃথিবীর বুকে আল্লাহর অলিগণের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় একটি নাম হিসাবে সালতানাত পরিত্যাগকারী, আল্লাহর মাহবুব খেতাব প্রাপ্ত, গাউসিয়তের মর্যাদাধারী, প্রিয় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বংশধর, শরীয়ত ও তরীকতের ইমাম, দ্বীনের মুজাদ্দিদ হযরত আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানীর (রাঃ) উল্লেখ করেছেন সর্বজনমান্য আউলিয়া জীবনী সংকলকগণ। তন্মধ্যে হযরত আবদুর রহমান চিশতীর (রাঃ) 'মেরাতুল আসরার' এবং হযরত শাহ্ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভীর (রাঃ) 'আখবারুর আখয়ার' উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীতে উর্দু ভাষায় গাউসে আলম হযরত আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী (রাঃ) এর জীবনের উপর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ প্রণীত হয়। তন্মধ্যে শেখুল মশায়েখ আবু আহমদ সৈয়দ মুহাম্মদ আলী হোসাইন আশরাফী (রাঃ) প্রণীত 'সহায়েফে আশরাফী' এবং হযরত মুহাদ্দিসে আজম হিন্দ কাচওয়াচী (রাঃ) প্রণীত 'হায়াতে গাউসে আলম' সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। উর্দু ভাষায় এর উপর এরূপ অসংখ্য গ্রন্থ প্রণীত হয়েছে কিন্তু বাংলা ভাষায় এর পূর্বে তাঁর কোন জীবনী রচিত হয়েছে বলে জানা যায় না। অথচ তিনি এদেশেই দীর্ঘদিন মুর্শিদের সেবায় জীবন অতিবাহিত করেছেন। এমনকি বাংলা ভাষায় তাঁর একটি কিতাবও রয়েছে বলে উল্লেখিত পাওয়া যায়। অবশ্য 'বাংলাদেশের সুফী সাধক' গ্রন্থে গোলাম সাকলায়েন প্রাসঙ্গিকভাবে আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানীর উল্লেখ করেছেন কয়েক স্থানে কিন্তু তা দ্বারা এ মহান বুযর্গের সম্বন্ধে ভালভাবে জানা সম্ভবপর নয়।

এ প্রেক্ষিতে আলহাজ্ব আবদুল্লাহ আশরাফীর প্রত্যক্ষ সাহায্য ও প্রেরণা এবং হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব কাজী মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন আশরাফীর তত্ত্বাবধানে তাঁর জীবনী তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছি। অত্যন্ত সংক্ষেপে সরল ভাষায় এ গ্রন্থটি লিখার চেষ্টা করেছি এবং বিভিন্ন মতান্তর ও ঐতিহাসিক তথ্যাবলীর যথাসম্ভব যাচাই করে অধিকতর যুক্তিযুক্ত মতকে প্রাধান্য দিয়ে তাই উপস্থাপন করেছি। এক্ষেত্রে উর্দু ভাষায় রচিত 'সহায়েফে আশরাফী' হযরত নঈম আশরাফ প্রণীত 'মাহবুবে ইয়াযদানী', হযরত সৈয়দ মওসুফ আশরাফ প্রণীত 'হায়াতে গাউসুল আলম' ডঃ সৈয়দ শাহ ফখরুদ্দীন আশরাফ প্রণীত 'হাজেরী ও চিল্লা' এবং বাংলা ভাষায় রচিত ডঃ গোলাম সাকলায়েন প্রণীত 'বাংলাদেশের সুফী সাধক' সহ আরো বহু গ্রন্থের সহায়তা নিয়েছি। আমি সবার কাছেই কৃতজ্ঞতা জানাই।

আল্লাহ তায়ালা সবাইকে যথাযথ প্রতিদান দিন!

বিনীত

আবু আহমদ জামেউল আখতার আশরাফী।

মুখবন্ধ

((আলহামদু লিল্লাহে রাব্বিল আলামীন, ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা আশরাফিল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালীন, ওয়া আলা আলিহী ওয়া আসহাবিহী ওয়া আওলিয়ায়ে উম্মতিহী ওয়া উলামায়ে মিল্লাতিহী ওয়া আলাইনা মায়াহুম আজমায়ীন))

মানব জাতি ও জ্বীন জাতির নিকট মহান স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালার সঠিক পরিচয় দান করে তাদেরকে শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদত এর প্রতি আহবান করেছেন অসংখ্য নবী-রসুল (আঃ)। এর সমাপ্তি ঘটে সর্বশেষ নবী হুযুর করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে। অতঃপর তাঁরই প্রদর্শিত পথ ও মতে মানব জাতিকে পরিচালনা করার এ মহান দায়িত্ব বর্তায় সাহাবা কেরাম, তাবেঈন; তা'বে তাবেঈন ও আউলিয়া কেরামের উপর। এভাবেই দ্বীন ইসলাম বিশ্বের আনাচে-কানাচে প্রচারিত ও প্রসারিত হয়ে আসছে-একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। যাঁদের আধ্যাত্মিক ক্ষমতার আলোকে মহান আল্লাহর মনোনীত দ্বীন ইসলামের সত্যতা মানসপটে রেখাপাত করে পথহারা অসংখ্য জনগোষ্ঠী সঠিক পথের সন্ধান পেয়েছে, তাঁদের অন্যতম একজন সাধক পুরুষ হলেন-ইরান এর সিমনান নিবাসী এককালীন ন্যায়পরায়ণ সুলতান হিসেবে খ্যাত, পরবর্তীতে জগতজোড়া আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব, প্রিয় নবী (দঃ) এর সম্মানিত বংশধর, গাউসে আলম, মাখদুম সুলতান, আউহাদুদ্দীন মীর সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী মাহবুবে ইয়াযদানী (রঃ)। এ মহান অলীর জীবনালেখ্য এক রহস্যময় অধ্যায়। এতে মুসলমানদের অনেক শিক্ষণীয় বিষয়াবলী নিহিত।

মহান আল্লাহর সান্নিধ্যধন্য আউলিয়া কেরামের জীবন চরিত, অর্থাৎ তাঁদের ঈমানী শক্তি, তাকওয়া-পরহেযগারী, খোদাভীতি, জ্ঞানান্বেষণ, রিয়াযাত-সাধনা, ইবাদত-বন্দেগী, ত্যাগ-তিতীক্ষা, খিদমতে খালক বা সৃষ্টি সেবা, আচার-আচরণ, খেদমতে দ্বীন ও কারামাত বর্ণনার ভিত্তি কোরআন-সুন্নায় নিহিত। হযরত মরিয়ম (আঃ), আসহাবে কাহাফ্ ও সুলাইমান (আঃ) এর সহচরদের অন্যতম হযরত আসেফ ইবনে বারখিয়া এর বিবরণ তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অতঃপর আউলিয়া কেরাম সম্পর্কে মহান আল্লাহ তায়ালার ঘোষণা- أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ

لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَكَانُوا۟ يَتَّقُونَ ۝

অর্থাৎ-"শুনো! নিশ্চয়ই আল্লাহর অলীগণের কোন ভয় ও দুঃখ নেই-যারা ঈমান গ্রহণ করেছেন এবং তাকওয়া অবলম্বন করেন।" এ ঘোষণা তাঁদের মহান মর্যাদাকে দিবালোকের মত উজ্জ্বল করে তুলেছে। তাঁরা দ্বীনের স্বার্থে সর্বস্ব ত্যাগ করে বিশ্বের

প্রত্যন্ত অঞ্চলে ভ্রমন করে মহান আল্লাহ তায়ালার ইংগিতে নানাবিধ ভ্রান্তি ও গোমরাহীতে লিপ্ত মানুষকে হেদায়ত করে দ্বীনের উল্লেখযোগ্য খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন।

হযরত মাখদুম, সোলতান, সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী মাহবুবে ইয়াযদানী (রঃ) পিতার ওফাতের পর অল্প বয়সে উত্তরসুরী হিসেবে মসনদে আরোহণ করেন। অল্প দিনের মধ্যে তাঁর ন্যায়পরায়ণতার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু, অদৃশ্য কারণে এদিকে তাঁর মন বসেনি। অতঃপর একরাত্রে তিনি আশেকে রসুল হযরত ওয়াইছ করনী (রঃ) এর সাক্ষাৎ লাভে তাঁর ফয়েয প্রাপ্ত হন এবং সালতানাতের প্রতি তাঁর অনিহা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এক পর্যায়ে তিনি তাঁর শ্রদ্ধেয়া আম্মাজানের অনুমতিক্রমে আল্লাহর পথে বেরিয়ে পড়েন। দেশ-দেশান্তর ঘুরে অসংখ্য অলিউল্লাহর আস্তানা সফর করে বাংলায় আগমন করেন এবং শেখ আলাউদ্দীন গানজে নাবাত পান্ডবীর নিকট বাইআত হন। অতঃপর তিনি দীর্ঘকাল রিয়াযাত করেন এবং স্বীয় পীরের খেলাফত লাভ করে দ্বীনের খিদমতে আত্মনিয়োগ করেন। এ লক্ষ্যে তিনি বিশ্বে অসংখ্য দেশ ভ্রমণ করেন। প্রত্যেক দেশেই অসংখ্য মানুষকে ইসলামে দীক্ষিত করে তাদের তা'লীম এর উদ্দেশ্যে খলীফা (প্রতিনিধি) নিয়োগ করেছেন। জীবনের শেষ প্রান্তে তাঁর ভাগনে আউলাদে রসুল (সঃ) আউলাদে গাউস, হযরত আবদুর রাযযাক নুরুল আইন (রঃ)কে স্বীয় স্থলাভিষিক্ত করেন এবং ভারতের উত্তর প্রদেশস্থ ফয়েযাবাদ জেলার অন্তর্গত কাচওয়াচা নামক তাঁর স্থায়ী আস্তানায় ৮০৮ হিঃ ওফাত প্রাপ্ত হন। এখানেই তাঁর পবিত্র মাযার অবস্থিত। প্রতি বৎসর মুহররম মাসের ২৭ ও ২৮ তারিখ তাঁর বার্ষিক ওরশ শরীফ অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিশ্বের অনেক রাষ্ট্র থেকে তাঁর সিলসিলাভুক্ত অগণিত ভক্তবৃন্দের সমাবেশ হয়। তাঁর পরবর্তী কালে স্থলাভিষিক্ত হিসেবে হযরত নুরুল আইন (রঃ) দায়িত্ব পালন করেন এবং অদ্যাবধি তাঁরই বংশধরগণ পুরুষ পরম্পরায় দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

বর্তমানে এ আস্তানা-এ আলীয়া অশরাফীয়ায় গদীনশীন হিসেবে শরীয়ত ও তরীকত এর মহান দায়িত্ব পালনে রত আছেন আমার মুর্শিদে আযম আশরাফুল মশায়েখ হযরতুলহাজ্ব আল্লামা শাহ আবুল মসউদ সৈয়দ মুহাম্মদ মুখতার আশরাফ আল আশরাফী আল জিলানী (মঃ জিঃ আঃ)। বিশ্বের অনেক দেশে আমার হুযুর কেবলার (মঃ জিঃ আঃ) মুরিদান রয়েছে। বাংলাদেশের রংপুর, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, সুনামগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, ঢাকা ও চট্টগ্রামে হুজুর কেবলা (মঃ জিঃ আঃ) ভক্ত অনুরক্ত ও মুরীদান রয়েছে। ময়মনসিংহের অষ্টগ্রাম এলাকায় হুজুর কেবলার (মঃ জিঃ আঃ) শ্রদ্ধেয় দাদাজান শেখুল মাশায়েখ, হযরতুল হাজ্ব, আল্লামা আবু আহমদ আলী হোসাইন আল আশরাফী আল জিলানী (রঃ) প্রকাশ 'আ'লা হযরত আশরাফী মিঞা" সর্বপ্রথম তশরীফ আনেন। অতঃপর তাঁর উত্তরসুরীগণ বাংলাদেশে অপরাপর এলাকায় সফর করে সিলসিলা-এ-আলীয়া কাদেরীয়া চিশতীয়া আশরাফীয়ার প্রচার-প্রসার করেন।

বর্তমানে হুযুর কেবলার (মঃ জিঃ আঃ) এর বড় শাহজাদা ও ভবিষ্যৎ স্থলাভিষিক্ত শেখুল মিল্লাত, হযরত আলহাজ্ব আল্লামা আবুল মাহমুদ সৈয়দ মুহাম্মদ ইজহার আশরাফ আল আশরাফী আল জিলানী (মঃ জিঃ আঃ) ও হযরতুলহাজ্ব আল্লামা সৈয়দ আনওয়ার আশরাফ আল আশরাফী আল জিলানী (মঃ জিঃ আঃ) বাংলাদেশের উল্লিখিত অঞ্চলে শুভাগমন করেন এবং তরীকতের দায়িত্ব পালন করেন।

সিলসিলা-এ-আলীয়া কাদেরীয়া চিশতীয়া আশরাফীয়া একটি ফয়েযপূর্ণ বিশুদ্ধ সিলসিলা। হুজুর গাউসে আযম (রঃ), খাজা গরীব নাওয়ায (রঃ) ও হযরত মাখদুম সোলতান সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী (রঃ) এর রূহানীয়াত ধন্য এ সিলসিলার অসংখ্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তন্মধ্যে শরীয়ত ও তরীকত উভয়ের পরিপূর্ণ অনুশীলন ও ইসলামের একমাত্র সঠিক রূপরেখা আহলে সুন্নাত জামাতের আক্বায়েদের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব অন্যতম। একারণে জগতবরেণ্য সুন্নী ওলামা কেরাম এ সিলসিলায় দীক্ষা গ্রহণ করেছেন। যাঁদের উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন- সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা সৈয়দ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী (রঃ), আল্লামা ফাখের ইলাহাবাদী, মুফতি-এ-আযম পাকিস্তান হযরত আল্লামা আবু বারাকাত, হাকিমুল উম্মত, মুফাচ্ছেরে কোরআন, হযরত আল্লামা মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁ নঈমী (রঃ) আল্লামা মুফতি আবদুর রশিদ, আল্লামা মুফতি মুহাম্মদ রেফাকত হোসাইন, শারেহে বুখারী ও অসংখ্য কিতাবের রচয়িতা হযরত আল্লামা সৈয়দ গোলাম জিলানী মিরাঠী, মুজাহিদে মিল্লাত আল্লামা হাবিবুর রহমান প্রমুখ ওলামা কেরাম।

হিজরী ত্রয়োদশ শতাব্দির মুজাদ্দিদ ইমামে আহলে সুন্নাত আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খাঁ ফাযেলে বেরেলভী (রঃ) যে সব পীর মশায়েখকে অতীব শ্রদ্ধার সাথে দেখতেন তন্মধ্যে আমার হুজুর কেবলা (মিঃ জিঃ আঃ) এর শ্রদ্ধেয় দাদাজান আলা হযরত আশরাফী মিঞা (রঃ) অন্যতম। আ'লে রসুল (দঃ) আউলাদে গাউস এর নুরানী চেহারা মুবারক দেখে ইমাম আহমদ রেযা খাঁ (রঃ) বলেছেন-

اشرفی اے رخت آئینۂ حسن وخوباں : اے نظر کردۂ و پردۂ سہ محبوباں

অর্থাৎ- 'হে আশরাফী মিঞা (রঃ) আপনার চেহারা জাহেরী-বাতেনী সৌন্দর্য্যের আয়না। আপনি তিন মাহবুব (অর্থাৎ-মাহবুবে ছোবহানী হুযুর গাউসে আযম (রঃ) মাহবুবে ইলাহী নেযামুদ্দীন (রঃ) ও মাহবুবে ইয়াযদানী হযরত মাখদুম আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী (রঃ) এর শুভ দৃষ্টি প্রাপ্ত ও তাঁদের রূহানী তত্ত্বাবধানে লালিত পালিত।'

অনুরূপ অপর একটি মন্তব্য থেকে এ দরবারের প্রতি আলা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খাঁ (রঃ) এর গভীর শ্রদ্ধার বহিঃ প্রকাশ ঘটে। যথা ইমাম ফযলে রসুল বাদায়ুনীর (রঃ) ওরশ শরীফে আলা হযরত (রঃ) এর উপস্থিতিতে একজন আলেম

ভূল ওয়ায করলে তিনি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে বললেন- "এসব কারণেই আজকাল ওয়ায়েজীন ও মীলাদ পাঠকারীদের ওয়াজ মাহফিলে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। (আর আ'লা হযরত আশরাফী মিঞা (রঃ) সম্পর্কে বললেন)- হযরত ঐ সব ব্যক্তিত্বদের অন্যতম যাঁর ওয়াজ আমি সন্তুষ্টচিত্তে শ্রবণ করি।" (হায়াতে আ'লা হযরত (রঃ) কৃত আল্লামা যফরুদ্দীন বিহারী রেজভী (রঃ) পৃঃ ১৮৫)।

অনুরূপ হাকিমুল উম্মত, মুফাচ্ছিরে কোরআন, শারেহে হাদিস, হযরত আল্লামা মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী আশরাফী (রঃ) এর একটি উক্তি এখানে উল্লেখ করা হলো-তিনি "তাঁর সফর নামা-এ হজ্ব ও যিয়ারাত" এর ৩৮ পৃঃ লিখেন- "সিমনান অত্যন্ত পবিত্র ও ঐতিহাসিক শহর। আমাদের "আশরাফী কাদেরী" সিল্সিলার উর্ধ্বতন আধ্যাত্মিক পুরুষ সুলতান আউহাদুদ্দীন সৈয়দ আশরাফ সিমনানীর (রঃ) জন্মস্থান, যাঁর পবিত্র মাযার ভারতের ফয়েযাবাদ জেলার 'কাচওয়াচা শরীফে অবস্থিত। আমাদের বাস কাফেলা সিমনান থেকে পেট্রোল কিনে নেয়। এ সুযোগে আমি এ পবিত্র ভূমিতে এ উদ্দেশ্যে অবতরণ করি যে, এখানকার কিছু ধুলাকণা আমি অপবিত্রের গায়ে, স্পর্শিত হয়ে আমার মাগফিরাত এর অসিলা হবে।"

এ মহান সাধক পুরুষ এর জীবনী গ্রন্থ অন্যান্য ভাষায় একাধিক রচিত হয়েছে। বাংলা ভাষায় এ পর্যন্ত পরিপূর্ণ কোন জীবনী গ্রন্থ রচিত হয়নি। বাংলাভাষী মুসলমানদের নিকট তাঁর আদর্শময় দীর্ঘ জীবন ও কর্ম তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তা দীর্ঘদিন ধরে উপলব্ধি করে আসছি। অবশেষে আমার পীর ভাই আলহাজ্ব মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আশরাফীর সার্বিক আন্তরিক প্রচেষ্টায় আবু আহমদ জামেউল আখতার আশরাফী এ মহান অলিউল্লাহর জীবনী সংকলনে দৃঢ়ভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। মহান আল্লাহর অপার অনুগ্রহে ও এ মহান অলীর নেক নযরে তিনি এতে সফল হন। মহান আল্লাহর দরবারে উভয়ের সার্বিক মঙ্গল কামনা করি।

শরীয়ত তরীকতের প্রতি মুসলমানদের উদাসীনতা ও লাগামহীনতার যুগে এ জীবনী গ্রন্থ সত্যন্বেষীদের পথ প্রদর্শনে সফল ভূমিকা রাখবে বলে আশা করি।-আমিন।

সালামান্তে-

কাজী মুহাম্মদ মুঈনউদ্দীন আশরাফী

*খলীফা/*আশরাফুল মশায়েখ, হযরত আল্লামা আলাহাজ্ব

সৈয়দ মুহাম্মদ মুখতার আশরাফ আল আশরাফী (মঃ জিঃ আঃ)

*মুহাদ্দিস-*ছোবহানিয়া আলীয়া মাদ্রাসা, পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম।

*খতীব-*খাতুনগঞ্জ হামিদুল্লাহ খাঁ জামে মসজিদ।

بسم الله الرحمن الرحيم

রূহানীয়তের শক্তিশালী আলোকধারায় পাপক্লিষ্ট ও পথচ্যুত মানুষগণকে হেদায়তের প্রোজ্জ্বল আলোকপথে টেনে এনে এ উপমহাদেশে যেসব মহান ব্যক্তিত্ব সর্বজন শ্রদ্ধেয় ও চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন তাঁদের মধ্যে সম্মুখসারির অবস্থানে হযরত মাহবুবে ইয়াযদানী, গাউসে আলম, তারেকুচ্ছালতানাত (বাদশাহী পরিত্যাগকারী) সৈয়দ মখদুম মীর আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী সামানী রাহমাতুল্লাহে তায়া'লা আলাইহের নাম অন্যতম।

তিনি তৎকালীন খোরাসানের বিখ্যাত রাজধানী শহর সিমনান হতে রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করে পঁচিশ বছর বয়সে বেরিয়ে পড়েন খোদায়ী প্রেমের অনির্বান আকর্ষণে। কিন্তু বহু সফর ও সাধকগণের সাথে মুলাকাত সত্বেও প্রাণের আসল উদ্দেশ্য হাসিল করতে শেষাবধি চলে আসেন বাংলাদেশেই, যেখানে তখন বিশ্ববিশ্রুত সাধক ব্যক্তি হযরত আলাউল হক পাণ্ডবীর (রঃ) খানকাহ ছিল। তিনি এখানে নিজকে সাধনায় উৎসর্গিত করলেন হযরত আলাউল হক পাণ্ডবীর (রঃ) শিষ্যত্বে।

দীর্ঘদিনের কঠোর পরিশ্রম ও প্রয়াসের পর এখান হতে হযরত আলাউল হক পাণ্ডবী (রঃ) হতে খেলাফত লাভ করে তাঁরই নির্দেশে দ্বীনের খেদমতের মানসে বেরিয়ে পড়লেন এবং শেষাবধি স্থায়ী আস্তানা প্রতিষ্ঠা করলেন বর্তমান ভারতের উত্তর প্রদেশস্থ জেলা ফয়েজাবাদে। এখানেই এ মহান বুযর্গের মাজার অবস্থিত। শুধু তাই নয়, তাঁর প্রতিষ্ঠিত সে হেদায়তের বটবৃক্ষ আজ অজস্র শাখা প্রশাখায় প্রসারিত হয়ে ছায়া দান করে চলেছে হেদায়ত ও খোদায়ী প্রেমে তৃষ্ণার্তদের।

হযরত মীর সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর (রঃ) আল্লাহর অপার দয়ায় এবং নিজের কঠোর রিয়াজত ও সাধনার মাধ্যমে বেলায়তের সর্বোচ্চ স্তর 'গাউসিয়ত' যেমন অর্জন করতে পেরেছিলেন, তেমনি খোদায়ী অনুগ্রহের ফলশ্রুতিতে খোদার পক্ষ হতে 'মাহবুব' খেতাবেও ভূষিত হন। এটা এক দূর্লভ প্রাপ্তি। ইতোপূর্বে হযরত মাহবুবে

সুবহানী গাউসুল আজম সৈয়দ মুহিউদ্দীন জিলানী (রঃ) এবং মাহবুবে ইলাহী হযরত নিজামুদ্দিন (রঃ) এ খেতাব লাভ করেছিলেন। তাই তাঁর এ রোতবা ও মর্যাদা এবং বিশ্বব্যাপী তাঁর খ্যাতি ও পরিচিতি, তরীকতে তাঁর সমন্বিত তরীকাহ এবং পরে তাঁর উত্তরাধিকারীগণের পারম্পর্য এবং তাঁদের বুযর্গী বিশ্বমুসলিমের নিকট ব্যথিত হৃদয়ের প্রশান্তি-জুড়াতে, তরীকতের শিক্ষা ও অনুশীলন পোক্ত করতে, হেদায়তের সত্যিকার আলোয় স্নাত হতে তাঁর মাজার শরীফকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠা মহান দরবারও এক আদর্শ প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি ও স্বীকৃতি লাভ করেছে।

ইতিহাস হতে জানা যায়, হিজরী সপ্তম শতাব্দীর শেষ দিকেও হযরত ইমাম হোসাইন (রঃ) এর শোনিতের উত্তরাধিকার বহনকারী একটি সৈয়দ বংশীয় ধারা মধ্য এশিয়ায় অবস্থিত খোরাসানের মধ্যে শক্তিশালী এক রাজত্ব পরিচালনা করে আসছিল। হযরত আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী (রঃ)-এরই পূর্বপুরুষ সৈয়দ তাজুদ্দিন বাহলুল হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে এ রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে সামানী বংশের দ্বিতীয় বাদশাহ আহমদ বিন ইসমাঈল সামানীর রাজত্ব কালেই এ রাজ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বাদশাহ আহমদ সামানী একজন শক্তিশালী নৃপতি ছিলেন। সমরকন্দ, বুখারা, ফরগানা, হিরাত এবং খোরাসান ও ইরান পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল।

বুখারার সিংহাসন নিয়ে ইসমাইল সামানীর সাথে তাঁর ভাই মাহমুদ সামানীর ঘোরতর বিবাদ হলে এ সময় আমীর ওমরাহগণ তাঁকে পরামর্শ দেন ভাইয়ের সাথে সন্ধি করে নিতে। কারণ মাহমুদের শক্তি ও সৈন্য সংখ্যা বেশী ছিল। কিন্তু তাঁর মন্ত্রী নিজামুদ্দীন বারমাকী ইসমাঈলকে তৎকালীন প্রসিদ্ধ তাপস হযরত সৈয়দ মাহমুদ নুর বখশীর কাছে গিয়ে দোয়া চাইতে পরামর্শ দিলেন।

ইসমাঈল সামানী এ পরামর্শ গ্রহণ করে অতিব ভক্তি ও শ্রদ্ধার সাথে হযরত সৈয়দ মাহমুদ নূর বখশীর দরবারে হাজির হয়ে দোয়া চাইলে তিনি ইসমাঈল সামানীর জন্য দোয়া করেন এবং ইসমাঈল বিজয়ী হন।

ইসমাঈল সামানীর পর তাঁর পুত্র আহমদ সামানী সিংহাসনে বসেন এবং হযরত মাহমুদ নূর বখশীর পুত্র সৈয়দ তাজুদ্দীন বাহলুল নুর বখশীকে স্বীয় মন্ত্রী নিযুক্ত করেন। একসময় সৈয়দ তাজুদ্দীনকে বাদশাহ আহমদ সামানী ইরাক ও খোরাসানের কিছু অংশ জায়গীর হিসাবে প্রদান করেন। আহমদ বিন ইসমাঈলের মৃত্যু হলে সৈয়দ তাজুদ্দীন বাহলুল এ স্থানগুলি নিয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং স্বাধীন নৃপতি হিসাবে রাজত্ব করতে থাকেন।

তাঁর রাজধানী ছিল সিমনান নামক শহরে। যা আজ ইরানের অন্তর্ভূক্ত সাধারণ একটি শহর। ইস্পাহান হতে দুশো মাইল দূরত্বে এর অবস্থান। এখানে তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে অত্যন্ত সুনাম ও কৃতিত্বের সাথে রাজ্য পরিচালনা করেন। প্রজা-সাধারণ তাদের সুলতান হিসাবে এ বংশের বুযর্গ ব্যক্তিগণের হাতে অত্যন্ত সমৃদ্ধি ও শান্তি অর্জন করে। রাজ্যের কোথাও কোন অভিযোগ ছিলনা। সকলে তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট ছিল।

সুলতানগণ ইসলামী আদব আখলাক ও শিক্ষার ব্যাপারে সকলে বিশেষ সচেতন ছিলেন। যার ফলে কালক্রমে সিমনান আলেম, ফাজেল, সুফী, দরবেশ ও জ্ঞানীদের শহরে পরিণত হয়। তাঁর পিতা সুলতান ইব্রাহীম এর শাসনামলেও পূর্বপুরুষগণের সুনামের উত্তরাধিকার বজায় থাকে। তিনি মাত্র বার বৎসর বয়সে স্বাধীন সুলতান রূপে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তাঁর শাসনামল ন্যায়পরায়ণতা, সমৃদ্ধি ও শান্তির জন্য সুপ্রসিদ্ধ। তিনি ব্যক্তিগতভাবে অত্যন্ত মুত্তাকী পরহেজগার এবং আলেম ও সুফী দরবেশ এবং জ্ঞানী গুণীদের বিশেষ মর্যাদা ও কদর করতেন। পঁচিশ বছর বয়সে তিনি সে সময়ের বিখ্যাত দরবেশ হযরত খাজা আহমদ বসভী (রাঃ) এর কন্যা খাদীজা বেগমকে বিবাহ করেন এবং আট বছরের মধ্যে তিনটি কন্যা সন্তান লাভ করে। কিন্তু তাঁরা পুত্র সন্তানের আশায় বিশেষ অধীর হয়ে পড়েন। কেননা সিংহাসনের উত্তরাধিকার রক্ষার জন্যই একজন পুত্র সন্তান একান্ত অপরিহার্য।

আল্লাহর দরবারে অধীর আকাংখা নিয়ে সর্বদা ফরিয়াদ করতে থাকাবস্থায় একদিন যুগশ্রেষ্ঠ বুযর্গ হযরত ইব্রাহীম মজযুব (রাঃ) এর বিশেষ দোয়ায় অবশেষে হিজরী ৭০৮ হিজরী সনে সবার মুখোজ্জ্বল করে জন্ম দিলেন হযরত সৈয়দ আশরাফ।

জন্মের পূর্বাভাস

সুলতান ও বেগম যখন একটি পুত্র সন্তানের জন্য একান্ত অধীর এবং খোদার দরবারে কাকুতি সহকারে প্রার্থনারত, এমনকি কোন অলী দরবেশের সাক্ষাত হলেই দোয়ার জন্য বলতেন, সে অবস্থায় একদিন তাঁরা ভোরে উভয়ে শাহী মহলের অভ্যন্তরে জায়নামাজে বসে ছিলেন। হঠাৎ দেখতে পেলেন বিখ্যাত মজযুব দরবেশ হযরত ইব্রাহীম তাঁদের দিকে এগিয়ে আসছেন। তাঁরা ভেবে পেলেন না যে, শাহী মহলে খাস কামরায় তিনি কিভাবে উপস্থিত হলেন! তৎক্ষণাৎ নিজেদের ধারণা সংশোধন করে নিলেন যে, আল্লাহর অলীগণ খোদায়ী শক্তিতে বলীয়ান তাই তাঁদের জন্য এতে আশ্চর্যের কি আছে! সুলতান তাঁর সম্মানে দাঁড়িয়ে তাঁকে সসম্মানে নিজের আসনে এনে বসালেন এবং স্বয়ং তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন।

দরবেশ বললেনঃ হে ইব্রাহীম, তুমি সন্তানের জন্য অধীর নয় কি? একথা শুনে সুলতান যারপর নাই খুশী হলেন এবং দরবেশের কথায় বিনীত সম্মতি দান করেন এবং দোয়া করার জন্য আবেদন জানালেন। তিনি সুলতানের জন্য দোয়া করলেন এবং প্রস্থান করতে উদ্যত হলেন। সুলতান তাঁর পিছনে কয়েক পা অগ্রসর হলে হযরত ইব্রাহিম তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, "একটি সন্তান তো নিয়েছই, আর কি চাও? ঠিক আছে, যাও, একটি নয় বরং দুজন পুত্র সন্তান দেয়া হবে।" অতঃপর তিনি যেভাবে হঠাৎ আবির্ভূত হয়েছিলেন, তেমনি হঠাৎ করে আবার গায়েব হয়ে গেলেন।

এমনিভাবে এক রাতে স্বপ্নের মাধ্যমে সুলতান ইব্রাহীমের সরকারে দোআলম হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাক্ষাতের সৌভাগ্য নসীব হয়। তিনি সুলতানকে লক্ষ্য করে এরশাদ করলেন, "হে ইব্রাহিম! আল্লাহ তায়ালা তোমাকে দুটি পুত্র সন্তান প্রদান করবেন। তাদের একজনের নাম রাখবে আশরাফ এবং দ্বিতীয় জনের আরাফ মোহাম্মদ। আশরাফ আল্লাহর অলী হিসাবে সারা দুনিয়াকে তার জ্ঞান ও গরীমায় বিশেষ উপকৃত করবে।"

তাই যেদিন হযরত আশরাফ জাহাঙ্গীর (রঃ) জন্মগ্রহণ করলেন সেদিন সারা রাজ্যে আনন্দের বান ডাকে। শাহী কোষাগার খুলে দেয়া হয় গরীব মিসকীনদের জন্য। সুলতানও আল্লাহর দরবারে বিশেষ শুকরিয়া আদায় করেন।

এ দিন হযরত ইব্রাহীম মজযুব পুনর্বার শাহী মহলে একাকি তশরীফ আনলেন এবং সুলতানকে সাবধান করে বললেনঃ "দেখ এ সন্তানের লালন পালনে বিশেষ সজাগ থাকবে, কেননা এ সন্তান খোদার পক্ষ হতে তোমার কাছে সোপর্দ করা আমানত স্বরূপ।" যদিও এমনভাবে সতর্ক করার কোনই প্রয়োজন ছিলনা তবুও যে সন্তান উভয় জগতের সালতানাত লাভ করার জন্য নির্বাচিত তার জন্য বাদশাহর চেয়ে দরবেশের ভালবাসা, স্নেহ ও উৎকণ্ঠা বিন্দুমাত্র কম ছিলনা, এটা তারই নমুনা।

শৈশবে শিক্ষাদীক্ষা

মাত্র ৪ বছর ৪ মাস ৪ দিন বয়সে অতি সাড়ম্বরে প্রথামতো তাঁর হাতেখড়ি করানো হলো। হযরত মাওলানা এমাদুদ্দিন তিরমিজী তাঁকে বিসমিল্লাহর সবক প্রদান করেন। হযরত আশরাফের আশ্চর্যজনক ধীশক্তি ও বিদ্যানুশীলনের আগ্রহ এ বাল্যকাল হতেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যখন তিনি সাত কেরাত সহকারে কোরান শরীফের হেফজ সমাপ্ত করে ফেলেন তখন তাঁর বয়স মাত্র পাঁচ বৎসর। সাত বছর বয়সেই

আরবী পরিভাষার উপর বিশেষ বুৎপত্তি অর্জিত হয়। অন্যান্য বিষয়াদিতেও তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল সমান। তিনি চৌদ্দ বৎসর বয়সে প্রচলিত সব বিষয়ের উপর গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। এর সঙ্গে অতি অল্প দিনে তিনি যুদ্ধবিদ্যাতেও পারদর্শিতা হাসিল করেন।

ফার্সী এবং আরবী উভয় ভাষায়ও তাঁর ছিল সমান দক্ষতা। উভয় ভাষারই তিনি যেন জন্মকবি। কবিতায় তাঁর এ সহজাত প্রতিভার প্রমাণ সর্বক্ষেত্রে বিদ্যমান। তিনি সুফী দরবেশগণের মজলিশেও উপস্থিত হতেন এবং তাঁদের খেদমত করার মধ্যে তাঁর বিশেষ আনন্দ ঔৎসুক্য ছিল। বিশেষতঃ তিনি প্রায়শঃ শেখ রুকনুদ্দিন আলাউদ্দৌলার খেদমতে উপস্থিত হতেন। ফলে ধীরে ধীরে তাঁর মধ্যে দরবেশী জীবনের প্রতি এক ধরনের আগ্রহ তখন থেকে জন্ম নেয়। পরে যা ক্রমশঃ তাঁকে পার্থিব জীবনের সকল আবিলতা, আগ্রহ ও মোহ থেকে দূরে নিয়ে যায় এবং অন্তরে রোপণ করে আল্লাহর প্রেমের অগ্নিশিখা।

সিংহাসনে আরোহণ

হযরত আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানীর (রঃ) বয়স প্রায় পনের সাল। তাঁর পিতা সুলতান ইব্রাহীম (রঃ) এর ইন্তেকালের প্রেক্ষিতে তিনি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলেন। তিনি ৭২৩ হিজরী সনে সুলতান হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণের পর চারদিকে সাড়া পড়ে গেল। তাঁর দক্ষতা, ন্যায়পরায়নতা ও বিচক্ষণতা দেখে সকলে বিস্মিত হলেন। বাঘ আর ছাগল এক ঘাটে পানি পান করার মতো সারা রাজ্যে শান্তি স্থাপিত হলো। ইন্সাফ আর শান্তি শৃংখলার এ ঈর্ষণীয় অবস্থান সম্পর্কে আশে পাশের শাসকদের মুখে মুখেও সুনাম ছড়িয়ে পড়লো।

হযরত শেখ আলাউদ্দৌলা সিমনানী একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। একদা মাহবুবে ইয়াযদানী হযরত আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী শিকারে বের হলেন। রাজ্যের প্রান্তসীমায় অবস্থিত জঙ্গলে শিকারের বন্দোবস্ত হলো। তিনি শিকারে গেলেও শিকার করার কোন ইচ্ছা বা স্পৃহা তাঁর ছিলনা। বরঞ্চ তাঁর সামনে কোন জীবজন্তু জীবন্ত ধরে আনা হলে তা তিনি মুক্ত করে দিতেন। প্রকৃতপক্ষে আমীর উমরাহগণের উৎসাহেই এ শিকারের আয়োজন করা হয়েছিল। এখানে অবস্থানকালে তার সম্মুখে এক বৃদ্ধা এসে অভিযোগ করলেন যে, হযরতের সৈন্যবাহিনীর এক সদস্য জোরপূর্বক বৃদ্ধার নিকট হতে দই ছিনিয়ে নিয়েছে। হযরত বৃদ্ধাকে ঐ লোক সনাক্ত করতে বললে জনৈক সৈন্যের দিকে সে ইঙ্গিত করল। হযরত তখন ঐ সৈন্যকে লক্ষ্য করে অভিযোগ সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করলেন কিন্তু সৈন্যটি অভিযোগ অস্বীকার করল এবং বলল যে, বৃদ্ধা মিথ্যা কথা বলছে।

বৃদ্ধা তার অভিযোগের স্বপক্ষে কোন সাক্ষীও দিতে পারলনা। তখন হযরত আশরাফ জাহাঙ্গীর (রঃ) বললেন, 'ঠিক আছে, আমি কৌশলে সত্য মিথ্যার যাচাই করে নিচ্ছি।'

কিছু মাছি ধর আনা হলো। অতঃপর তিনি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তা খেতে নির্দেশ দিলেন। লোকটি তা খাওয়া মাত্র তার বমি হলো। বমির সাথে উদর হতে ইতিপূর্বে গলধারণকৃত দই এর কণাও বের হয়ে আসল। ফলে বৃদ্ধার অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হলো। উক্ত সৈন্যের ঘোড়া, ও ঘোড়ার জিন ও লাগাম বৃদ্ধাকে প্রদান করা হলো এবং সৈন্যটিকে শাস্তি প্রদান করা হলো। এ ঘটনা হতে হযরত আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানীর অসাধারণ বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যায়।

এ সম্পর্কে আরো একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। একদিন তিনি মসনদে বসে দরবার পরিচালনা করছিলেন। একজন লোক এক আর্জি নিয়ে হযরতের কাছে উপস্থিত হলেন। লোকটি ছিলেন একজন ছন্নছাড়া দরবেশ মুসাফির।

তিনি বললেন যে, বিগত রাতে তিনি একদল লোকের সাথে সফরকালে রাতে বিছানায় আরাম করছিলেন। তাঁর কোমরে চল্লিশটি স্বর্ণমুদ্রা রক্ষিত ছিল। কাফেলায় অবস্থানরত কোন চোর সেগুলি হাতিয়ে নিয়েছে। কাফেলার কোন লোকই সেটা স্বীকার যাচ্ছেনা। এমতাবস্থায় হুজুর যেন তার প্রতিবিধান করেন।

হযরত আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী (রঃ) তৎক্ষণাৎ ঐ কাফেলার সমস্ত লোককে দরবারে হাজির হতে নির্দেশ দিলেন। তারা শাহী দরবারে এলো কিন্তু সকলেই বিনীত ভাবে অর্থ চুরির ব্যাপারে অভিযোগ অস্বীকার করল এবং কসমপূর্বক বলল যে, তারা ফকিরের অর্থ নেয়নি। তখন হযরত আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী (রঃ) দরবারে উপস্থিত সভাষদ ও পারিষদবর্গকে লক্ষ্য করে বললেন যে, এখন তো অর্থ চুরির এ ঘটনা প্রমাণের কোন উপায়ই নাই। তখন ফকির কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'হুজুর! আমার অর্থও চুরি হলো আর সকলে কসম করে আমাকে প্রকারান্তরে অপদস্তও করল।

হযরত আশরাফ জাহাঙ্গীর কিছুক্ষণ মৌন থেকে তারপর সকল লোককে একজন করে নিজের নিকটে ডেকে পাঠাতে লাগলেন এবং তাদের বক্ষের উপর নিজ হাত মোবারক স্থাপন করতে লাগলেন। এভাবে দশজন অতিক্রান্ত হলো। একাদশ ব্যক্তির বুকে হাত রাখার পর তিনি অনুভব করলেন যে, সে লোকের বুকের ভিতর যেন হাতুড়ির পিটুনি চলছে এমনিভাবে তার বুক ধড়ফড় করছিল। তখন হযরত সুলতান আশরাফ

জাহাঙ্গীর সিমনানী কিছুক্ষণ গভীরভাবে তার প্রতি পর্যবেক্ষণ করে হুকুম দিলেন - 'উক্ত লোক হতে ফকিরের হারানো স্বর্ণমুদ্রা আদায় করা হবে, একে নিয়ে যাও।'

পরে রাজকর্মচারীগণ একটু চাপ দিতেই সে লোক অভিযোগ স্বীকার করে নিল এবং স্বর্ণমুদ্রাগুলি ফেরত দিল। এমনিভাবে প্রতিদিন হযরতের দরবারে অপরাধীগণ ধরা পড়ে যেত। হযরত সুলতান আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী (রঃ) এর বিচক্ষণ বিচার কার্যে এভাবে সকল অভিযোগকারী সঠিক রায় পেয়ে সন্তুষ্ট হতো।

যুদ্ধ

তিনি অতি সুচারুরূপে রাজ্য পরিচালনা করে আসছিলেন। রাজ্যে পূর্ণ শান্তি শৃংখলা ও সমৃদ্ধি সাধিত হতে থাকে। তিনি ছিলেন পূর্বপুরুষগণের মতো স্বাধীন নৃপতি। বাগদাদের খলীফা এ রাজ্যের অধিপতিদের বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মান করতেন। তাই হযরত সুলতান আশরাফের নামে খোতবা প্রদান করা হতো এবং মুদ্রায় তাঁর নাম অংকিত থাকতো।

এদিকে একেতো বয়সে অতি তরুণ, অভিজ্ঞতায় শূন্য এবং স্বভাবে মহানুভব, দায়িত্বে প্রজাহিতৈষী, তাই সুলতানকে দেখে পার্শ্বস্থিত শক্তিশালী মোঙ্গলীয়দের লোভ সৃষ্টি হয়। তারা সীমান্তে বেশ কয়েকবার অতর্কিত হামলা চালিয়ে লুঠতরাজ করে।

এ ঘটনা শান্তিপ্রিয় তরুণ সুলতানের জন্য একটা চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেখা দেয়। পারিষদবর্গ সুলতানকে বললেন যে, একজন দক্ষ সেনাধ্যক্ষের অধীনে শক্তিশালী সেনাদল পাঠিয়ে হানাদারদের সমুচিত শিক্ষা দেয়া হোক। তাঁরা সুলতানকে সশরীরে যুদ্ধে যেতেও বারণ করতে লাগলেন। বয়সে ও অভিজ্ঞতায় তরুণ সুলতান যুদ্ধে যাবেন, সেটা তাঁরা চাইলেন না। তাঁরা ভাবলেন, এ অল্প বয়সেও জ্ঞান গরীমা এবং পরহেজগারীতে সুলতান একজন উঁচু মরতবার ব্যক্তি হলেও যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় নৈপুণ্য ও ধারণা সম্পর্কে তাঁর বাস্তব কোন অভিজ্ঞতা ছিলনা বিধায় যুদ্ধে হয়তঃ কাঙ্খিত ফল আসবেনা।

কিন্তু সুলতানের শিরায় যে শোহাদায়ে কারবালার তেজস্বী শোনিতের ধারা প্রবহমান, তাঁর পক্ষে পারিষদ বর্গের উদ্বেগাকুল পরামর্শ গ্রহণ কি করে গ্রহণ করা সম্ভব হবে! তাই তিনি এ যুদ্ধে অংশগ্রহণের দৃঢ় অভিপ্রায় জানিয়ে দিলেন এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ফেললেন। তিনি সসৈন্যে মোঙ্গলদের মুখোমুখি হলেন। উভয় পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এতে মোঙ্গলদের শোচনীয় পরাজয়

করলেন। তাঁর মহিয়সী আম্মা হযরত খাদিজা বেগম তাঁকে বললেন, 'প্রিয় সন্তান! তুমি জন্ম গ্রহণের পূর্বেই সুলতানুল আরেফীন হযরত খাজা আহমদ বসভী (রঃ) স্বপ্নে আমাকে তোমার জন্মের সুসংবাদ দিয়ে বলেছিলেন যে, আমাকে এমন সন্তান প্রদান করা হবে, যার বেলায়তের সূর্যালোকে গোটা পৃথিবী আলোকিত হবে এবং তার হেদায়তের ফলে পৃথিবী হতে গোমরাহীর তমসা দূরীভূত হবে। হয়তঃ আজ সে ভবিষ্যদ্বানীরই বাস্তব রূপ লাভ করতে যাচ্ছে। তাই আমি তোমাকে আল্লাহর হাতে সোপর্দ করছি।"

সফর শুরু

আম্মাজানের অনুমতি নিয়ে তিনি খোদার রাহে বেরিয়ে পড়লেন সবকিছু পরিত্যাগ করে। তাঁর পিছনে পড়ে রইল রাজসিংহাসন, রাজ্য ও রাজত্ব, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, সঙ্গী সহচর সকলেই। তবে তাঁর আম্মাজানের ইচ্ছানুযায়ী বিশেষ আড়ম্বর ও আয়োজন সহকারে তাঁকে সিমনানের শেষ সীমানা পর্যন্ত লোকজন বিদায় জানাতে এসেছিল। সকলে অশ্রুসজল নয়নে হযরতকে বিদায় জানিয়েছিলেন। হযরতের অন্তরও বিচ্ছেদ বেদনায় বিমুঢ় হয়েছিল।

হযরত সিমনান হতে প্রথমে বুখারায় গিয়ে পৌছেন এবং জনৈক 'মজযুব' দরবেশের সাক্ষাত লাভ করেন। তিনি হযরত এর সাথে বুক মিলালেন এবং স্বীয় কপালকে হযরতের কপালের সাথে স্থাপন করে হযরতের চুল ধরে মাথা হেলাতে লাগলেন। এভাবে কিছুক্ষণ পর মজযুব দরবেশ হযরতকে পূর্বদিকে ইশারা করে অবিলম্বে রওয়ানা হবার নির্দেশ দিলেন।

হযরত বুখারা হতে সমরকন্দে এলেন। সমরকন্দের শেখুল ইসলাম হযরতের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হলেন এবং তাঁকে নিজ গৃহে নিয়ে গিয়ে বিশেষ যত্নের ব্যবস্থা করলেন। এখানে একরাত অবস্থানের পর তিনি আবার রওয়ানা হলেন।

সমরকন্দ পর্যন্ত তাঁর দুজন খাদেম কিছুতেই তাঁর সঙ্গ ছাড়ছিলেন না। তিনি এখানে নিজেদের পথচলার বাহন ঘোড়াগুলি প্রথমে ফকির মিসকিনকে দান করে দিলেন ফলে পথচলার কষ্ট যথেষ্ট বৃদ্ধি পেল। খাদেম দুজন খুব কাহিল হয়ে পড়ে। রাতে যখন বিশ্রামের জন্য যাত্রা বিরতি করা হয় তখন তারা গভীর নিদ্রায় ঢলে পড়ে। কিন্তু হযরত আশরাফ জাহাঙ্গীরের চোখে ঘুমের লেশমাত্র ছিলনা। তিনি অজু করে নামাজে দাঁড়িয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর তাঁর মনে ঐ সহচর দুজনকেও পরিত্যাগ করার বাসনা জাগে। তাই তাদের আগোচরে তিনি রাতের আঁধারিতে তাদের ছেড়ে অন্যত্র চলে

গেলেন। এভাবে অতীত জীবনের সব সহচর, সম্পদ ও সঙ্গী হতে তিনি পুরোপুরি মুক্ত হলেন।

মাসের পর মাস জঙ্গল, পাহাড় ও বন্ধুর পথ অতিক্রম করে অবশেষে তৎকালীন সিন্ধু-প্রদেশের প্রখ্যাত শহর, 'উঝ'-এ পৌছেন। (এটি বর্তমানে মুলতানের সন্নিকটে একটি পুরাতন শহর হিসাবে পরিচিত)। এখানে তখন বিশ্বখ্যাত সাধক হযরত **মখদুম জালাল উদ্দিন জাহানিয়া জাহাগঁশত** (রাঃ) এর খানকাহ প্রতিষ্ঠিত ছিল। তিনি অতি উচ্চ পর্যায়ের অলি ছিলেন। আরব ও আজমের বহু জ্ঞানী-গুণী সাধকের নিকট হতে তিনি বহু গুরুত্বপূর্ণ আধ্যাত্মিক বিষয়ে লাভবান হন। বহু মশায়েখ তাঁকে নিজেদের তরীকা ও সিলসিলার খেলাফত প্রদান করেছিলেন। চিশতীয়া তরীকার মধ্যে তিনি হযরত নাছির উদ্দিন 'চেরাগে দিল্লী' (রঃ) হতে খেলাফতপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। এখানে এসে হযরত আশরাফ জাহাঙ্গীর হযরত জালাল উদ্দিন (রঃ) এর সাথে মোলাকাত করলেন। হযরত জালাল উদ্দিন সুলতান আশরাফ জাহাঙ্গীরকে খুব সস্নেহ সমাদর করলেন এবং তিনদিন তাঁকে এখানে রেখে অনেক অমূল্য জিনিষ দান করেন। তারপর অবিলম্বে তিনি তাঁকে বাংলা অভিমুখে রওয়ানা হবার নির্দেশ দিয়ে বললেন, "দেরী করোনা, হযরত আলাউদ্দিন গঞ্জেনাবাত (রঃ) তোমার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান।"

হযরত আশরাফ সেখান হতে অতঃপর দিল্লী এসে পৌছলেন। এখানকার বেলায়তধারী বুযর্গ তাঁকে দেখে বললেন, "আশরাফ" তোমাকে স্বাগতম। কিন্তু তোমার এখানে বিলম্ব করা ঠিক হবে না ভাই। আলাউদ্দিন গঞ্জেনাবাত (রঃ) তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন।" এভাবে এখান হতে তিনি তাঁর নির্দেশনা মোতাবেক পূর্বদিকে রওয়ানা হলেন।

পীর ও মুর্শিদের দরবার

যে পীর ও মুর্শিদের সাক্ষাৎ লাভের সুতীব্র তাড়নায় তিনি সিংহাসন পরিত্যাগ করে অশেষ কষ্ট ও পরিশ্রম সহ্য করেছেন, সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছেন এবং হযরত খিজির (আঃ) হতে আরম্ভ করে বিভিন্ন দরবেশ যে পীর ও মুর্শিদের পবিত্র ভূমির দিকে সফর করার জন্য দিক বাতলিয়েছেন, অবশেষে সে মহান মুর্শিদের পবিত্র সান্নিধ্য ও সঙ্গ লাভের সময় ঘনিয়ে এলো। তিনি পান্ডুয়া বা পান্ডবের হযরত সুলতানুল মুরশেদীন শেখ আলাউল হক ওয়াদ্দীন গঞ্জেনাবাত (রঃ) এর খানকার দিকে এগিয়ে আসতে লাগলেন।

বলা বাহুল্য, পীর ও মুর্শিদ পূর্ব হতেই তাঁর আগমনের ব্যাপারে জ্ঞাত। জানা যায় যে, হযরত খিজির (আঃ) তাঁর সম্পর্কে হযরত আলাউদ্দিনকে সত্তর বার (৭০) জ্ঞাত করেছেন। তাই তিনি তাঁর জন্য অধীর হয়ে অপেক্ষা করছিলেন। হযরত আশরাফ যখন পাণ্ডুয়া শরীফের (পাণ্ডব) নিকটবর্তী হন তখন হযরত আলাউল হক স্বীয় কামরায় আরাম করছিলেন। তিনি অদৃশ্যভাবে জানতে পারলেন হযরত আশরাফের আসার ব্যাপারে। কয়েকদিন পূর্বেই তিনি স্বীয় মুরিদ ও সঙ্গীগণকে বলেছিলেন যে, যার জন্য তিনি দীর্ঘ দুই বছর অপেক্ষমান, তিনি আজ কালের মধ্যে এসে পৌছবেন। (হযরত আশরাফ জাহাঙ্গীরের সিমনান হতে 'পান্ডব' পৌছতে দুই বছর সময় লাগে। মুর্শিদ সে দুই বছর সময় অপেক্ষার কথাই বলেছেন)।

এখন তাঁকে এগিয়ে আনার জন্য হযরত আলাউল হক (রঃ) স্বীয় কামরা হতে বাইরে এলেন এবং এরশাদ করলেন, "বুয়ে ইয়ার মী আয়দ" অর্থাৎ 'বন্ধুর সুবাস ভেসে আসছে।' অতঃপর তিনি সঙ্গী সহচর ও মুরিদগণের বিরাট এক মিছিলসহ স্বীয় খানকা হতে বের হলেন। এটা সত্যিই এক অপূর্ব দৃশ্য! হযরত আলাউল হক (রঃ) অতি বিখ্যাত ও বুযর্গ ব্যক্তি হিসাবে বাংলার তৎকালীন বাদশাহর কাছে পর্যন্ত শ্রদ্ধেয়। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও বুযর্গীই তাঁকে এ বিরল সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী করেছে। অথচ তিনিই যাচ্ছেন একজন মেহমানকে মহা সমাদরে এগিয়ে আনার জন্য! নিশ্চয় সেই মেহমান হযরতের কাছে তেমনই প্রিয় ও আদরের!

অবশেষে হযরত আশরাফও দূর হতে হযরত আলাউল হক (রঃ)কে দেখে চিনতে পারলেন এবং তিনি দৌড়ে এসে তাঁর কদমের উপর উপুড় হয়ে পড়লেন। হযরত আলাউল হক (রঃ) তাড়াতাড়ি সৈয়দ আশরাফকে বুকে উঠিয়ে নিলেন এবং বললেন, "তোমার আসার পূর্বে হযরত খিজির (আঃ) তোমার আসার ব্যাপারে সত্তর বার আমার কাছে এসেছেন এবং বলেছেন যেন তোমার যত্নে কোনরূপ ঢিলেমি না দেখানো হয়। যেহেতু তুমি আল্লাহর এক আমানত স্বরূপ যা আমার নিকট এসে উপনীত হবে।"

হযরত সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর (রঃ) স্বীয় পীর ও মুর্শিদকে দূর থেকে দেখেই আত্মহারা হয়ে পড়েছিলেন এবং মুর্শিদও তেমনি এক তীব্র আবেগ অনুভব করেছিলেন। অদৃশ্য এক আকর্ষণের তীব্রতা অবশেষে উভয়ের মিলনের মাধ্যমে প্রশমিত হলো।

হযরত আলাউল হক (রঃ) তাঁকে এগিয়ে আনতে বিরাট আয়োজন করেন যা থেকে হযরত সৈয়দ আশরাফের প্রতি তাঁর তীব্র অনুরাগ ও ভালবাসা অনুমান করা যায়।

তিনি নিজের ব্যবহারের পালকি এবং স্বীয় পীর ও মুর্শিদ হযরত আখী সিরাজুল হক (রঃ) এর ব্যবহৃত পালকি যা তাঁর হস্তগত হয়েছিল তাতে চড়ে দরবারে অবস্থিত সকল খলীফা, সঙ্গীসহচর, মুরীদ ও ভক্তগণকে নিয়ে শহর হতে প্রায় আট মাইল দুরে 'মালদহের' নিকটে পৌছেছিলেন। সেখানে অবস্থান করে অস্থিরভাবে খোঁজ করছিলেন বাংলার দিকে আসা কাফেলা সমূহে কাঙ্খিত ব্যক্তিকে। অবশেষে যখন তাঁর দেখা মিলল তখন অতি সমাদর করে স্বীয় খানকায় নিয়ে আসেন।

খানকায় পৌছে হযরত আলাউল হক (রঃ) অতি আদরের সাথে সৈয়দ আশরাফকে নিকটে বসালেন এবং বললেন, "বৎস! আজ পার্থিব মোহ থেকে হাত ধুয়ে ফেল, নইলে মিলনের মধুরতা থেকে বঞ্চিত থাকতে হবে।" হযরত আশরাফ এ কথা শুনে অতি বিনয়ের সাথে উত্তর করলেন যে, হ্যাঁ, তিনি এ থেকে পূর্বেই পবিত্র হয়েছেন বলে আজ মহান মুর্শিদের দরবারে উপস্থিত হবার সৌভাগ্য নসীব হয়েছে।

তারপর তিনি প্রিয়তম এ ভক্তকে নিজ হাতে আহার্য মুখে তুলে খাওয়ালেন। ইতিপূর্বে এ পরম সৌভাগ্য অন্য কারো ললাটে জোটেনি। তাই দরবারের সকলে বিস্ময়াভিভুত হয়ে গেলেন। খাওয়া শেষে তিনি সকল লোককে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য ইঙ্গিত করলে সকলে কামরা হতে বেরিয়ে গেল। শুধুমাত্র মীর সৈয়দ আশরাফ স্বীয় মুর্শিদের সাথে থাকতে পেলেন। পীর ও মুর্শিদ তাঁকে একাকি বাইয়াত করালেন এবং নেয়ামত দানে সৌভাগ্যবান করলেন। সৌভাগ্যের পেয়ালা আজ কানায় কানায় পরিপূর্ণ হলো। পীর মুর্শিদ তাঁকে নিজে হাত ধরে কামরার বাইরে এলেন, তখন তাঁর চেহারায় স্বর্গীয় নূরের আভা বিকির্ণ হতে লাগল। মুর্শিদ তাঁকে নিয়ে সকলের সামনে এলেন এবং পুনরায় খানকায় প্রবেশ করে বিবিধ 'বরকতময় স্মারক' নিয়ে এসে বললেন, "হে আমার সঙ্গী সাথীরা! জেনে রেখো, বুযর্গানে কেরামের এসব বরকতময় স্মৃতি স্মারক দীর্ঘদিন ধরে গচ্ছিত ছিল। এখন এর প্রাপক উপস্থিত হয়েছে, আমি তাকে এগুলি প্রদান করলাম।" ঐ সব তিনি হযরত সৈয়দ আশরাফকে প্রদান করলেন। এভাবে পীর ও মুর্শিদ তাঁকে দীক্ষিত করে নিলেন এবং তিনিও স্বীয় পীরের সেবায় নিজকে উৎসর্গ করলেন। তিনি বিভিন্ন সময়ে সর্বমোট বার বৎসর পীর ও মুর্শিদের সেবায় অতিবাহিত করেন। হযরত আলাউল হক (রঃ) আল্লাহর পথের সন্ধানে এসে আস্তানায় স্থান গ্রহণকারীদের কঠোর পরিশ্রম ও সাধনায় নিয়োজিত করতেন। এমন কি স্বীয় সন্তান নূরে কুতুবে আলম যিনি পরে বিশ্বখ্যাত সাধক হয়েছেন, তাঁকেও ভিত্তি

ও অন্যান্য দৈহিক পরিশ্রম করাতেন। অথচ সৈয়দ আশরাফকে কোন কাজ করতে দিতে সম্মত হননি।

এখানে থাকাকালে তিনি স্বীয় মুর্শিদকে বিনীতভাবে বলতেন, হুজুর, আমাকে খানকায় কোন কাজ করার সুযোগ দিন। কিন্তু পীর ও মুর্শিদ তা সস্নেহে প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলেন, "তোমার সম্পর্কে হযরত খিজির এত বেশী প্রশংসা করেছেন যে, তোমাকে কাজ করাতে আমার লজ্জা হয়।" বরঞ্চ তিনি প্রিয়তম মুরিদকে সর্বদা নিজের সাথেই রাখতেন। কোন কাজ করতে দিতেন না। তবুও হযরত আশরাফ জাহাঙ্গীর (রঃ) নিজে সময় পেলে খানকায় ঝাড়ু দেয়ার কাজ করতেন। এভাবে পীর ও মুর্শিদের কাছে চার বছর অতিবাহিত হলো। এ সময় তিনি পীর ও মুর্শিদ হতে অসাধারণ এক নেয়ামত লাভে ধন্য হন।

হযরত আলাউল হক (রঃ) এর ইচ্ছা হলো তাঁকে কোন উপাধি দেয়া যায়। এ ইচ্ছায় তিনি 'গায়ব' হতে নির্দেশ লাভের অপেক্ষা করতে লাগলেন।

জাহাঙ্গীর উপাধী লাভ

একদা শবে বরাতে তিনি অজিফা ও তসবীহ্-জিকিরে নিয়োজিত হন। সারা রাত তসবীহ্ তাহ্লীল ও মোরাকাবা মোশাহাদায় সোবহে সাদেক হয়ে গেল। এমতাবস্থায় গায়ব হতে আওয়াজ ধনিত হলো- জাহাঙ্গীর! জাহাঙ্গীর! এ আওয়াজ শুনে তিনি বলে উঠলেন, 'আলহামদুলিল্লাহ্! প্রিয় বৎস আশরাফ এ উপাধিতে ভূষিত হলো।' সেই থেকে তাঁর নামের সাথে জাহাঙ্গীর সংযুক্ত হয়। শুধু তাই নয়, রমজান মাসের সাতাশ তারিখ কদর রাত হযরত আলাউল হক (রাঃ) তাঁকে মারফতের গুঢ় রহস্যাদি সম্পর্কেও পরিপূর্ণ জ্ঞান প্রদান করেন। এ অবস্থায় হযরত তাঁকে বললেন, "বৎস! কথায় বলে যে এক বনে দুটি বাঘ বাস করেনা এবং এক খাপে দুটি তলোয়ার থাকতে পারেনা। তাই আমি তোমার জন্য এমন একটি স্থান নির্বাচিত করতে চাই যেখানে তুমি আপন কর্মতৎপরতা শুরু করবে এবং তোমার দয়ায় লোকজন উপকৃত হবে, আল্লাহর অগণিত বান্দা তোমার দ্বারা হেদায়ত লাভে ধন্য হবে।"

জবাবে হযরত আশরাফ জাহাঙ্গীর (রঃ) বলতে লাগলেন, 'যাঁর সান্নিধ্যের জন্য সিংহাসন ত্যাগ করে, আত্মীয়-পরিজন বন্ধু-বান্ধব সব কিছু ছেড়ে অশেষ কষ্ট ও পরিশ্রম করেছি, যাঁর সাহচর্য লাভের জন্য অবর্ণনীয় ত্যাগ স্বীকার করেছি এবং যাঁর ছায়াতলে জীবন কাটানোর অদম্য বাসনায় আমার জীবন মন ও সর্বস্ব সঁপে দিয়েছি,

আজ সে ছায়া হতে বঞ্চিত হয়ে বিরহের অসহ্য যাতনা নিয়ে নির্বাসনসম এ ব্যবস্থা আমি কিভাবে গ্রহণ করতে পরি?'

বস্তুতঃ মুর্শিদের সাথে বিচ্ছেদ - ভাবনা তাঁকে একেবারে কাবু করে ফেলে। তাঁর মনের এ অস্থিরতা দেখে পীর ও মুর্শিদ তাঁকে শান্তনা দিয়ে এরশাদ করলেন, "বৎস! এটা বিচ্ছেদ নয় বরঞ্চ এতে আল্লাহর ইচ্ছার প্রতিফলন রয়েছে।" তবে আরো দুই বছর অতিক্রান্ত হলো। অতঃপর হযরত আলাউল হক (রঃ) তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, "তোমাকে বিদায় করার সিদ্ধান্তের মধ্যে কিছু রহস্য আছে, যা তুমি জাননা। তুমি বরঞ্চ এতে সম্মত হও।"

হযরত আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী (রঃ) স্বীয় মুর্শিদের এ কথার উপর দ্বিমত করা সঙ্গত মনে করলেন না। অনিচ্ছা থাকলেও নিরুপায় হয়ে তিনি মুর্শিদের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে সম্মত হলেন। তখন হযরত আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানীর (রঃ) পীর ও মুর্শিদের ইচ্ছানুযায়ী জৌনপুরে যাওয়া স্থির হলো। এভাবে দীর্ঘ সাড়ে ছয় বছর কাল পর পীর ও মুর্শিদ হতে বিচ্ছিন্ন হয় তিনি ৭৪২ হিঃ সনে ঈদের দিন জৌনপুর অভিমুখে রওয়ানা হন।

জৌনপুরে তখন বিখ্যাত সাধক শেখ হাজী সদরুদ্দীন চেরাগে হিন্দ সোহরাওয়ার্দী বাস করছিলেন। পীর ও মুর্শিদের কাছে হযরত সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর তাঁর দিকে ইঙ্গিত দিয়ে বাঘের নিবাস হিসাবে জৌনপুরকে আখ্যা দিলে পীর সাহেব জবাব দিয়েছিলেন, 'না' ভয়ের কিছু নাই। তাঁকে বাঘ নয়, বাঘের শাবক হিসাবেই পাবে। সে নিজেই তোমাকে বাঘ হিসাবে বুঝে শুনে চলবে।'

যাত্রার পূর্ব হতে পীর ও মুর্শিদ তাঁর যাত্রার জন্য এতো বিপুল আয়োজন ও বাদশাহী আড়ম্বরের ব্যবস্থা করেছিলেন যা দেখে সত্যিই অভিভূত হতে হয়। যেন কোন রাজা সাড়ম্বরে প্রমোদ ভ্রমনে বের হয়েছেন! তাঁকে দেয় সাজসজ্জা ও সফরের সাথী উপাদান ইত্যাদি দেখে সে ভ্রম হওয়া স্বাভাবিক। বিদায় কালেও হযরত আলাউল হক (রঃ) প্রচুর লোকজনসহ প্রায় এক ক্রোশ (দুই মাইল সম) পরিমান সাথে এসেছিলেন।

হযরত যখন যাত্রাপথে 'আরুল' নামক স্থানে উপনীত হয়ে যাত্রা - বিরতি করেন তখন এখানকার একজন সূফী তাঁর সাথে দেখা করতে আসেন। তাঁর নাম শেখ সমন। তিনি হযরতের শাহী পরিচ্ছদ ও সফর সমগ্রীর আড়ম্বর দেখে মনে মনে

ভাবতে লাগলেন যে, এসব বাদশাহী পোষাক ও সামগ্রী এবং খাদেমগণের সেবার সাথে দরবেশের কি সম্পর্ক থাকতে পারে?

আশরাফ জাহাঙ্গীরের (রঃ) কাছে তাঁর মনের কথা গোপন রইলনা। তিনি তখন উত্তর দিলেন 'না, না,' আমার কলব ও মনের উপরতো এসবের কোনই প্রভাব নাই। আসলেই এসব কিছু ছিল লোক দেখানো খোলস মাত্র। বিন্দু মাত্র মোহ বা আসক্তি তাঁকে স্পর্শ করেনি। হযরত শেখ সমন আরুলী নিজের ভুল বুঝতে পারলেন এবং খুশী মনে বিদায় নিলেন।

হযরত চলতে চলতে আজমগড় জেলার মোহাম্মদআবাদ পৌঁছেন এবং বসতির বাইরে এক বাগানে তাঁবু গেঁড়ে অবস্থান করতে লাগলেন। লোকজন তাঁর সাথে এসে সাক্ষাত করতে লাগল। বহু আলেম ফাজেলও তাঁর নিকট সাক্ষাতের জন্য আসেন। এরূপ শহরের কয়েকজন আলেম এসে হযরতের সাথে নানা বিষয়ে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করলেন। এক পর্যায়ে সাহাবা কেরামের মর্যাদা ও সম্মান বিষয়ে কথা উঠল। হযরত এ বিষয়ে চমৎকার তাফসীর পেশ করলেন যাতে আগন্তুক আলেমগণ অত্যন্ত মুগ্ধ হলেন। তখন হযরত বললেন যে, এ বিষয়ে স্বীয় একটি কিতাবও রয়েছে। তাঁরা সেটা দেখতে আগ্রহী হলে কিতাবটি এনে তাঁদের দেখানো হলো। তাঁরা সকলে অত্যন্ত সন্তুষ্ট ও হযরতের প্রতি আকৃষ্ট হলেন কিন্তু কাজী আহমদ নামক একজন পণ্ডিত আপত্তি উঠালেন যে, হযরত আলী (রঃ) সম্পর্কে এখানে হযরত আবু বকর (রঃ) ও ওমর (রঃ) এর চাইতে অধিক গুরুত্ব দেয়ায় ভুল হয়েছে। আরো কয়েকজন আলেম সে কথা সমর্থন করলেন। তখন হযরত আশরাফ জাহাঙ্গীর (রঃ) তাঁদের কাছে স্বীয় মত সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে আরম্ভ করলে তারা এ নিয়ে বিতর্ক আরম্ভ করে দেন। বিভিন্ন রেসালা কিতাবের উদ্ধৃতি সহকারে তাঁরা হযরতকে শিয়া মতের সমর্থক প্রমানিত করে তখনকার মতো প্রস্থান করেন। তাঁরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, এ ফতোয়া লিখে তাঁরা জুমার দিন জামে মসজিদে প্রকাশ করবেন এবং লোকজনকে এ বুযর্গের ব্যাপারে সতর্ক করে দিবেন। কিন্তু জুমার দিন এমন ঝড় বৃষ্টি হলো যে, কোন লোকই মসজিদে আসতে পারলনা। এ নিয়ে ব্যাপক জল্পনা কল্পনা শুরু হলো সাধারন মানুষের মধ্যে। অনেকে পণ্ডিত ও আলেমগণের ব্যাপার নিয়ে খুব ভীত হলেন যে, এটা নিশ্চয় সৈয়দজাদার সাথে বেয়াদবীর প্রেক্ষিতে আসমানী হুঁশিয়ারী।

আলেমদের মধ্যে সৈয়দ খান নামক একজন ছিলেন। তিনি স্বপ্নে দেখলেন যে, হযরত আশরাফ জাহাঙ্গীর (রঃ) রাসুলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কলিজার টুকরা, তাঁর সামনে উপস্থিত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। তিনি স্বপ্ন বৃত্তান্ত সকালে

স্ত্রীর কাছে প্রকাশ করলেন। তাঁর পূণ্যময়ী স্ত্রীও তাঁকে স্বপ্নাদেশ প্রতিপালন করতে পরামর্শ দিলেন।

উল্লেখ্য যে, ঐ দম্পতির কোন সন্তান ছিলনা। দীর্ঘদিন হতে তাঁরা সন্তানের আকাংখায় অধীর। কোন বুযর্গের সাক্ষাত পেলেই নিজেদের জন্য তাঁরা দোয়া চাইতেন। তাই তাঁর স্ত্রী আরো বললেন, "নিশ্চয় উনি আল্লাহর অলি হবেন, তাঁর কাছে সন্তানের জন্য দোয়া চাইবে। হয়তো তাঁরই দোয়ার বরকতে আমাদের ঘর আলোকিত হবে। তাছাড়া আমার আরো মনে হচ্ছে, হয়তো ইনি ঐ বুযর্গ যাঁকে আমি একদা সপ্নে দেখেছিলাম যিনি জৌতির্ময় বুযর্গ বেশে আমাকে চারটি আম প্রদান করেছিলেন।"

এ কথা শুনে মৌলানা সাহেব কালবিলম্ব না করে হযরতের দরবারে পৌঁছে বার বার ক্ষমা চাইতে লাগলেন এবং বললেন, "হুজুর আপনি চিন্তা করবেন না। আমি আপনার সম্পর্কে আপত্তিকারীদের বক্তব্যের দাঁতভাঙ্গা জবাব প্রদান করব। এভাবে বিভিন্ন কৌশলে অবশেষে মৌলানা সৈয়দ খান সাহেব হযরতের বিমর্ষতা ও বিষন্নতা দূর করতে সক্ষম হলেন। হযরতের চিত্ত পূনরায় প্রসন্ন হলো। কিছুক্ষণ পর মৌলানা সাহেব উঠে চলে যেতে উদ্যত হলে হযরত তাঁকে চারটি আম দিয়ে বললেন, "মাওলানা! আপনার কাছে চারটি সন্তানের শুভ আগমন হোক। তাঁদের নাম রাখবেন- তাহের, মুতাহের, তৈয়ব এবং মুহাম্মদ। ইন্‌শাল্লাহু চারজনই জ্ঞানে মর্যাদায় সুখ্যাত হবে।" মৌলানা সাহেব খুব খুশী মনে ঘরে ফিরলেন। তাছাড়া আম পাওয়ার প্রেক্ষিতে হযরতের প্রতি মৌলানার শ্রদ্ধা ও আস্থা অনেক বেড়ে গিয়েছিল। এদিকে পরবর্তী জুমায় আলেম ও পণ্ডিতবর্গ তাঁদের সে ফতোয়া জনসমক্ষে উপস্থাপন করলেন। তখন মৌলানা সৈয়দ খান ফতোয়াটি হাতে নিলেন এবং উঠে দাঁড়িয়ে সবার সামনে এক পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা পেশ করে বললেন যে, হযরত আশরাফ জাহাঙ্গীর (রঃ) হযরত আলী (রঃ) এর প্রশংসায় বেশী গুরুত্ব দেয়ায় অপরাধ করেননি। কেননা এটি সৈয়দজাদা ব্যতীত কেউ করলে ধর্তব্য হতো। যেহেতু প্রত্যেকে স্বীয় বংশধরদের প্রশংসায় বেশী গুরুত্ব দিবেন এটা স্বাভাবিক। তাই এ বিষয় নিয়ে সৈয়দজাদার (হযরত আশরাফ) সমালোচনা ও দোষী সাব্যস্ত করা সঠিক নয়। উপস্থিত আলেমগণ তাঁর এ ধারনার সপক্ষে দলিল চাইলে তিনি 'জামেউল উলুম' নামক কিতাব হতে এ ব্যাপারে উদ্ধৃতি পেশ করলেন- "النّاس ابناء الوالدين ولا يلام الرّجل على حب ابويه وبمدحهما"

(অর্থাৎ প্রত্যেক লোক পিতামাতার সন্তান। কোন লোককে স্বীয় পিতা মাতার ভালবাসা ও প্রশংসা কীর্তনের ব্যাপারে তিরস্কার করা যেতে পারে না।)

আপত্তিকারী আলেমগণ নিজেদের ভুল বুঝতে পারলেন এবং হযরতের কাছে ক্ষমা চাইতে লাগলেন। হযরত আশরাফ জাহাঙ্গীর (রঃ) সৈয়দ খান ও তাঁর সাথী কাজী হামিদুদ্দিনকেও অনেক দোয়া করলেন। ঘটনার পর আরো কয়েকদিন তিনি এখানে অবস্থান করে জাফরাবাদের দিকে রওয়ানা হলেন।

জাফরাবাদে অবস্থান ও কারামত

হযরত জৌনপুরের সংলগ্ন জাফরাবাদে এসে উপনীত হয়ে জাফরাবাদের 'জাফর খান মসজিদে' বিরতি অবস্থানের সিদ্ধান্ত নিলেন। এখানেও আশ্চর্যময় ঘটনা প্রকাশিত হয়ে পড়ে। যার ফলে তাঁর খ্যাতি ও সুনাম ছড়িয়ে পড়তে থাকে। কথিত আছে যে, হযরত মসজিদেই অবস্থান নিলেন। এখানেই তাঁর নির্দেশ মোতাবেক সফর সামগ্রী নামিয়ে রাখা হলো। সওয়ারী ও ভার বহনকারী পশুগুলিকেও মসজিদের ভিতরে বাঁধার জন্য তিনি নির্দেশ দিলেন। লোকজন এসে এ অবস্থা দেখে হৈ চৈ শুরু করে যে, এ কেমন দরবেশ! দেখতে তো বড় আলেমও মনে হয় অথচ মসজিদের অবমাননা করছেন! তখন কিছু লোক হযরতকে মসজিদের বাইরে কোথাও গিয়ে অবস্থান করতে বাধ্য করার জন্য এগিয়ে এল। কিন্তু দরবেশের সামনে এসে তাঁর মহিমার সামনে তারা অত্যন্ত সংকুচিত হয়ে পড়ল। কোন ক্রমেই সামনে এগিয়ে যেতে পারলনা। তারা সকলে কাছাকাছিই বসে পড়লো একস্থানে।

বসেই তারাতো হতবাক ! যা দেখতে পাচ্ছে তাতো অস্বীকার করার উপায় নেই। অথচ এ কিভাবে সম্ভব! তারা লক্ষ্য করলো মসজিদে অবস্থিত পশুগুলি হযরতের দিকে তাকায় আর কিছু যেন বিবৃত করে ইশরায়। হযরত জনৈক খাদেমকে ডেকে পশুটিকে বাইরে নিয়ে গিয়ে পেশাব করিয়ে আনার জন্য নির্দেশ দেন। অপর একটি ঘোড়াকে ও একইভাবে মলত্যাগ করিয়ে আনা হলো। অতঃপর হযরত কিছুক্ষন চুপ থাকার পর আগন্তুক লোকদের লক্ষ্য করে এরশাদ করলেনঃ "জন্তু জানোয়ারের ক্ষেত্রে তাদের ময়লা ও অপবিত্রতার কারণে তাদেরকে সমজিদে বাঁধার ব্যাপারে ফকিহগণ নিষেধ করেছেন। যখন আমার পশুগুলির সে দোষ অবশিষ্ট নাই তখন মসজিদের ভিতরে তাদেরকে বাঁধার ক্ষেত্রে কোন বাধাও নাই। তবে মসজিদের আদবের দিকে লক্ষ্য

রেখে অবশ্য না বাঁধা উচিৎ কিন্তু আমিতো মুসাফির, এগুলোর হেফাজতের প্রয়োজনেই আমার কাছে মসজিদে বাঁধা হয়েছে।

আগন্তুক লোকগুলি হযরতের কাছে এ কৈফিয়ত শুনে যার পর নাই অভিভুত হয়ে গেল এবং হযরতের প্রতি তাদের আস্থা স্থাপিত হলো। এখানে অবস্থান কালে তাঁর কাছে বহু লোক বাইয়াত গ্রহণ করে। বহু লোক তাদের দুঃখ - দূর্দশার জন্য দোয়া করিয়ে নেয়। বিশেষতঃ পার্শ্ববর্তী গ্রাম সরওয়ারপুরস্থ শেখ কবীর নামক এক যুবক আলেমের হযরতের খেদমতে এসে বাইয়াত গ্রহণ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। হযরতের কাছে বাইয়াত গ্রহণের পুর্বে তিনি প্রায়শঃ হাজী চেরাগে হিন্দ এর দরগায় যাওয়া আসা করতেন। হযরত চেরাগে হিন্দ সোহরাওয়ার্দী তরীকার একজন কামেল বুযর্গ ছিলেন। এখানে তাঁর অবস্থান এর ব্যাপারে হযরত সৈয়দ আশরাফ (রঃ) অবহিত ছিলেন বিধায় স্বীয় মুর্শীদকে বলেছিলেন যে, সেখানে বাঘ আছে, সে কথা পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে। হযরত চেরাগে হিন্দ এর নিকট সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানীর (রঃ) এখানে থাকাটা মোটেই পছন্দনীয় হচ্ছিলনা। উপরন্তু শেখ কবির এতদিন তাঁর দরবারে যাওয়া আসা করতেন বলে তাঁর ধারনা ছিল যে, তাঁরই কাছে উনি বাইয়াত গ্রহণ করবেন। তাই যখন তিনি হযরত সিমনানী (রঃ) এর কাছে বাইয়াত গ্রহণের কথা জ্ঞাত হলেন তখন খুব ক্ষুদ্ধ ও মনক্ষুন্ন হলেন।

যদিও এ ধরনের আচরণ সুফিয়ানা আচরণ ও স্বভাবের পরিপন্থী এবং এটা ফকির দরবেশদের কাছ হতে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত তবুও মানবিক কারনে যে ক্ষোভের শিকার হলেন তাতে সাময়িক ভাবে বিস্মৃত হলেন এবং শেখ কবিরকে বদদোয়া করে বসলেন যে, তিনি যেন এ যুবা বয়সেই মৃত্যুবরণ করেন। এ কথা জানতে পেরে শেখ কবির চিন্তিত হলেও তাঁর চিত্ত অচঞ্চল ও ধৈর্যশীল রইল। তিনি উল্টো বলে বসলেন, তিনি যে বদদোয়া আমার জন্য করেছেন সেটা যেন তাঁর উপর নিপতিত হয় এবং আমার পুর্বেই যেন তিনি মৃত্যুবরণ করেন। উভয়ের দোয়াই আল্লাহ তায়ালার দরবারে কবুল হয়ে যায় এবং ইন্তেকাল করেন। যা হোক, অবশ্য পরে হাজী চেরাগে হিন্দ হযরত আশরাফ জাহাঙ্গীর সিননানী (রঃ) এর প্রতি নিজ ধারনা সংশোধন করে নিয়েছিলেন।

হযরত শেখ কবির অসামান্য উঁচু মরতবার অলি ছিলেন। তিনি ঐ যুবা বয়সে ইন্তেকালের প্রাক্কালে তাঁর একটি অল্প বয়সের শিশু সন্তান রেখে যান। তার নাম মোহাম্মদ। হযরত সিমনানী ঐ শিশুর লালন পালনের ভার গ্রহণ করে নেন এবং শিশুটিকে পরে শিক্ষা দীক্ষায় সত্যিকার উপযুক্ত করে খেলাফত প্রদান করেছিলেন।

হযরত তাঁকে বড় ভালবাসতেন এবং 'দুররে ইয়াতীম' নামে সস্নেহ সম্বোধন করতেন। হযরতের সাথেই তিনি জীবন অতিবাহিত করতেন।

পবিত্র স্থানসমূহের জেয়ারত

হযরত মীর সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী (রঃ) জাফরাবাদে কিছুদিন অতিবাহিত করার পর পবিত্র স্থান সমূহের জেয়ারত করতে মনস্থ করলেন। তিনি সম্ভবঃ ৭৪৫ হিঃ সনে এখান থেকে সফরে বের হয়ে পড়েন। তিনি সমুদ্র পথে বসরায় পৌছেন এবং হযরত খাজা হাসান বসরী (রঃ) এবং অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় সুফী দরবেশগণের মাজার শরীফ জেয়ারত করেন। এখান হতে কারবালায় অবস্থিত হযরত হোসাইন (রঃ) এর মাজার শরীফে উপনীত হন। জেয়ারতের পর পুনরায় রওয়ানা হয়ে নজফ হয়ে বাগদাদ শরীফে গিয়ে হযরত গাউছুল আজম সৈয়দ শাহ আবদুল কাদের জিলানী (রঃ) ও হযরত মারুফ করখী (রাঃ) সহ অন্যান্য মহান বুযর্গগণের মাজার শরীফের জিয়ারত করলেন। এখানে তিনি কয়েকদিন বুযর্গগনের সাথে সাক্ষাত এবং লোকজনকে ওয়াজ নসীহতে অতিবাহিত করলেন। অতঃপর তিনি হযরত গাউছুল আজম (রঃ) এর জন্মস্থান গিলানের দিকে যাত্রা করলেন। এখানে হযরত গাউছুল আজম (রঃ) এর বংশের একজন বুযর্গ ব্যক্তি ছিলেন হযরত সৈয়দ হোসাইন আবদুল গফুর। তিনি সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর (রঃ) এর খালাত বোনকে বিবাহ করার প্রেক্ষিতে পূর্বপরিচিত ছিলেন। সৈয়দ আশরাফ (রঃ) কয়েকদিন তাঁদের আতিথেয়তায় অবস্থান করলেন এবং দামেশ্‌ক অভিমুখে রওয়ানা হন।

নূরুল আইন আবদুর রাজ্জাক (রঃ)

গিলানে খালাত বোনের বাড়ীতে অবস্থানকালে তাঁদের পুত্র সৈয়দ আবদুর রাজ্জাক হযরতের অতি প্রীতিভাজন হন। তখন তাঁর বয়স ছিল বার বছর। কিন্তু অতি ভদ্র নম্র এবং চরিত্রবান সৈয়দজাদার স্বভাব চরিত্রেই ফুটে উঠত যে, বেলায়তের এক মহান মর্তবা যেন তাঁর জন্য নির্দ্ধারিত রাখা হয়েছে। হযরতের খেদমতে তিনি সর্বদা উপস্থিত থাকতেন। যখন হযরত সৈয়দ আশরাফ (রঃ) ইরাক ত্যাগ করে পুনরায় সফরের উদ্দেশ্যের কথা ব্যক্ত করলেন তখন হযরত আবদুর রাজ্জাকও তাঁর সঙ্গে যাওয়ার জন্য স্বীয় মাতা পিতার কাছে অনুমতি চাইলেন। তাঁরা তাঁকে বহু রকমে নিবৃত্ত করতে চাইলেন কিন্তু ব্যর্থকাম হলেন। পরে তাঁরা ভেবে দেখলেন যে, এ অল্প বয়সেই যখন তাঁর মধ্যে মারেফাতে এলাহীর প্রতি এমন ঔৎসুক্য ও আগ্রহ জন্মলাভ

করেছে তখন কেনইবা তাতে বাঁধা সৃষ্টি করবেন? তাঁরা সানন্দে স্বীয় পুত্রকে হযরত আশরাফ জাহাঙ্গীর (রঃ) এর হাতে সোপর্দ করলেন এবং হযরতও তাঁকে সন্তান হিসাবে গ্রহণ করে নূরুল আইন (চোখের জৌতি) খেতাবে ভুষিত করলেন। তিনিই পরবর্তীতে হযরতের স্থলাভিষিক্ত হন এবং আশরাফী বংশীয় ধারা তাঁরই মাধ্যমে বিস্তৃত হয়।

রওজা আকদাস জেয়ারত

হযরত আশরাফ জাহাঙ্গীর (রঃ) এখান হতে আবদুর রাজ্জাক সহ অতঃপর দামেশক (সিরিয়ার বর্তমান রাজধানী) গমন করেন এবং সেখানে রমজান মাস অতিবাহিত করে ঈদের পর পর মদীনা মোনাওয়ারায় রাসুলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এর জেয়ারতের মনস্থ করলেন এবং মদীনা শরীফ গমন করেন। কিন্তু মদীনা শরীফ পৌঁছে তিনি কঠিন পীড়াক্রান্ত হয়ে পড়লেন। বিশ দিন পর্যন্ত এভাবে পড়ে থাকলেন। একুশতম রাতে আকায়ে নামদার তাজেদারে মদীনা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর সম্মুখে দৃশ্যমান হলেন এবং এরশাদ করলেন, 'বৎস! উঠো', তোমার পীড়া দুরীভুত করা হয়েছে। তোমার যে অশেষ কাজ অপূর্ণ! কত অসংখ্য মানুষ তোমারই হাতে হাত রেখে মুসলমান হবার অপেক্ষায় এবং কত মুসলমান তোমারই মাধ্যমে মারেফাতে এলাহীর সবক গ্রহণ করে সাধারণ্যের সারি হতে বিশেষ ব্যক্তিগনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে তার ইয়ত্তা নাই'। বস্তুতঃ সকাল হতেই না হতেই দেখা গেল যে, তাঁর শরীর দ্রুত সুস্থ হয়ে চলেছে। মুহর্তের ব্যবধানেও যেন সে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছিল।

বায়তুল্লাহর হজ্ব

আরো কিছু দিন এখানে অতিক্রান্ত করলেন। অতঃপর হজ্বের সময় আসন্ন হলে মদীনা শরীফ হতে মক্কা মোকাররমায় তশ্‌রীফ আনয়ন করলেন এবং হজ্ব সমাপন করলেন।

মক্কা মোকারমায় তশরীফ আনার পর কাবা শরীফে হযরতের সাথে দুজন প্রখ্যাত সাধকের মোলাকাত হয়। তাঁরা হচ্ছেন হযরত ইমাম আবদুল্লাহ্ ইয়াফেয়ী (রঃ ওফাত ৭৫০ হিঃ) এবং হযরত সৈয়দ আলী হামদানী (রঃ)। উভয়ই অতি মর্যাদাবান উচ্চ মর্তবার সুবিজ্ঞ আলেম ও কামেল অলি ছিলেন। বেশ কিছুদিন হযরত মক্কা শরীফে অবস্থান করলেন। অতঃপর হযরত আলী হামদানী (রঃ) সহ হযরত আশরাফ জাহাঙ্গীর পুনরায় বেরিয়ে পড়লেন সফরের উদ্দেশ্যে। 'মদীনাতুল আওলিয়া' হয়ে

তাঁরা মিশরের 'জবলুল ফাতাহ' পৌছেন। এ পর্বতটি সুফীগনের নিকট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন। কারণ কোন সুফী নিজ অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে বারংবার ব্যর্থ হলে এখানে নির্দিষ্ট সময় অবস্থান করে থাকেন, যার ফলে তিনি সফলতা অর্জন করেন। এ জন্যই এ পর্বতটি 'জবলুল ফাতাহ' বা বিজয়ের পর্বত নামে আখ্যায়িত।

হযরত এখানে অলিগনের সাথে সাক্ষাত করেন এবং অতঃপর পাহাড়ে তিনিও ধ্যান সাধনায় কিছুকাল অবস্থান করেন। এখান থেকে ইয়েমেনে এসে পৌঁছলেন এবং একটি মসজিদে অবস্থান নিলেন। তাঁর সাথে পরবর্তীতে আবুল গায়ছ ইয়ামেনী নামক বিখ্যাত বুযর্গ উপস্থিত হলেন। তাঁর সাথে ইতোপূর্বে মিশরেই হযরতের সাক্ষাৎ হয়েছিল। তিনি এসে হযরতকে বললেন, এ বৎসরতো ইয়েমেনে বহু দুর্যোগ দুর্ঘটনা হবার রয়েছে। সাধারণের সহ্য ক্ষমতার বাইরে এবার ভয়াবহ দুর্যোগ নেমে আসবে ইয়েমেনবাসীদের উপর। হযরত বললেন যে, তাঁরও সে রকম ধারনা হচ্ছে। তখন শেখ ইয়ামেনী বললেনঃ আমরা এ বালা মুসিবৎ নিজেদের মাথায় কি উঠিয়ে নিতে পারিনা, যাতে সৃষ্টিকুল নিরাপদ হয়? অতঃপর উভয় বুযর্গ সারা রাত এবাদতে নিমগ্ন হয়ে রইলেন এবং খোদায়ী দরবারে বারংবার আকুতি জ্ঞাপন করে সব বালা মুসিবৎ নিজেদের উপর টেনে নিতে থাকেন। এভাবে ভোর হলে দেখা গেল উভয় বুযর্গের চেহারা পান্ডুরবর্ণ ধারন করেছে। দেখে মনে হচ্ছিল যেন কেউ তাঁদের শরীরের রক্ত সমূহ শোষন করে নিয়ে ফেলেছে। তাঁরা এত দুর্বল হয়ে পড়েন যে, তিনদিন পর্যন্ত তাঁদের নড়াচড়া করার ক্ষমতা ছিলনা। এভাবে ইয়েমেনবাসী রক্ষা পেল।

বলা বাহুল্য যে, আল্লাহর অলিগন সৃষ্টিকুলের অশেষ কল্যান করে থাকেন। স্রষ্টার এবাদতের পাশাপাশি সৃষ্টির কল্যান কর্মে জীবন উৎসর্গ করে স্রষ্টার রেজামন্দী হাসিল করতে তাঁরা সর্বদা তৎপর থাকেন।

পুনরায় মুর্শিদের দরবার

এভাবে বিভিন্ন দেশসমূহ ভ্রমণ করে, পবিত্র স্থানসমূহ জেয়ারত সমাপন পূর্বক এবং হজ্ব সম্পন্ন করে দীর্ঘ সফর শেষে পাণ্ডুবে মুর্শিদের আস্তানায় প্রত্যাবর্তন করেন। অতঃপর প্রায় তিন থেকে চার বৎসর পর্যন্ত মুর্শিদের খেদমতে থাকার পর এখান হতে বিদায় নেন। বিদায় কালে মুর্শিদ তাঁকে আধ্যাত্মিক দৃষ্টি দ্বারা স্বীয় কর্মস্থল নির্দেশ করেন। হযরত আশরাফ বলেন, সেটি একটি গোলাকার পুষ্করিণী হিসাবে আমার বাতেনী কাশফের চোখে দৃশ্যমান হয়, যার মধ্যবর্তী স্থানে একটি তিলের ন্যায় ফোঁটা

রয়েছে। মুর্শিদ তাঁকে বলেন, যেটি তিলের মতো দেখতে সেটি একটি টিলা। এটাই তোমার গন্তব্য স্থান।

বসতি হলো বিরান

হযরত প্রথমে বিহার প্রদেশে এলেন এবং এখানে সুনভদর নামক বড় নদীর ধারে একটি জনবসতিতে একদিন অবস্থান করেন। অবস্থানকালে বিকাল বেলা সফরের রসদপত্রাদির তত্ত্বাবধানের ভার একজন দরবেশের উপর ন্যস্ত করে সকলে বিভিন্ন কাজে বের হলে সেখানকার গোত্রাধিপতির পুত্র এসে সেখানে উপস্থিত হলো। সে উক্ত দরবেশের সঙ্গে অতি উদ্ধত ও অভদ্র আচরণ করতে থাকে। এমনকি এক পর্যায়ে দরবেশের মাথায় পাথর মেরে বসে। এতে দরবেশের মাথা ফেটে প্রচুর রক্তপাত হয়। হযরত আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী এ ঘটনা অবগত হয়ে অত্যন্ত মর্মাহত হলেন এবং বললেন, "যেখানে দরবেশের রক্ত ঝরে সেখানে বসতি থাকতে পারেনা। সবকিছু বিরান হয়ে যায়।" ইতিহাস সাক্ষী যে, হযরতের সে কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছিল।

কারামত ❒ পাথরের প্রতিমার মুখে সত্যের কলেমা

হযরত এখান থেকে রওয়ানা হয়ে এক সময়ে বেনারসে পৌছেন। বেনারসে দিন কয়েক থাকতে মনস্থ করলেন। একদিন হযরত দেখতে পেলেন, কিছু লোক পাথরের প্রতিমা তৈরী করে সেগুলোর পূজা করছে। তিনি তাদের সামনে উপস্থিত হলেন। তাঁর নূরানী ও জ্যোতির্ময় চেহারা দেখে পূজারত লোকগুলি অভিভূত বিস্ময়ে কিছুক্ষণের জন্য যেন হতবাক হয়ে রইল। তাদের কয়েকজন হযরতের নিকট তাদের দ্বীন-ধর্মের সত্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে বিতর্ক করতে চাইল। তখন হযরত বললেন, "আমি দলিল প্রমাণ নিয়ে বিতর্ক করা মোটেই পছন্দ করিনা। তার চাইতে বরং যাদেরকে 'মাবুদ' জ্ঞান করছ সে প্রতিমাগুলিই যদি তোমাদের বিপক্ষে আমাদের ধর্মের কলেমা পাঠ করে তখন কি তা মেনে নেবে?" তারা সকলে একবাক্যে সে কথা মেনে নেয়ার অঙ্গীকার করলে হযরত একটি প্রতিমা হাতে উঠিয়ে সেটিকে লক্ষ্য করে বললেন, "হে প্রতিমা! যদি দ্বীনে মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) সত্য হয় তবে তুমি কলেমা পড়ে শুনিয়ে দাও।" এ ঘটনা দেখার জন্য অনেক লোক একত্রিত হয়েছিল এবং সকলে শুনতে পায় যে, পাথরের প্রতিমার মুখে বুলি ফুটেছে এবং সুস্পষ্টভাবে পাঠ করল - কলেমা তৈয়ব 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ।'

সেদিন দ্বীনে ইসলামের সত্যতা ও আল্লাহর অলির এই অলৌকিকত্ব দেখে তৎক্ষণাৎ কয়েক হাজার অমুসলমান ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছিল।

কাচওয়াচা শরীফে আগমন ও একটি কারামত

হযরত বেনারস হতে জৌনপুর গমন করেন। জৌনপুর হতে আসলেন কিরমিনী নামক স্থানে। দুই তিনদিন এখানে থেকে সেখান হতে দুই ক্রোশ (চার মাইল) দূরে অবস্থিত ভডবন্ড বা ভদড় (এটিই বর্তমান কাচওয়াচা শরীফ) নামক স্থানে তশরীফ আনলেন। এখানকার শাসক মাহমুদ এবং তাঁর পুত্রগণসহ বহুলোক হযরতের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করলেন এবং হযরতের সার্বিক সাহায্যে এগিয়ে আসেন।

উল্লেখ্য যে, এ স্থান হযরতের কাছে অত্যন্ত পছন্দ হলো। তাঁর মুর্শিদের নির্দেশিত স্থান হিসাবে তিনি এটিকে চিহ্নিত করলেন এবং এখানে থাকতে চাইলেন। জানা গেল, এখানকার সবচাইতে আকর্ষণীয় স্থান বলতে একটি গোলাকৃতির পুষ্করিণীর পাড় দরপণ নাথ নামক জনৈক তান্ত্রিক সাধু দখল করে রেখেছে। তিনি মাহমুদকে সাথে নিয়ে সে স্থানটি দেখতে গেলেন এবং দেখে বললেন, "এটিই আমার স্থান হবে, যার কথা আমার পীর সাহেব আমাকে বলেছিলেন। বেদ্বীনদের উচ্ছেদ করা কঠিন কিছু নয়।"

অতঃপর তিনি একজন খাদেমকে দিয়ে তান্ত্রিক সাধুকে ঐ স্থান ত্যাগের নির্দেশ দিলেন। কিন্তু সাধু উত্তরে বললো, "আমার পক্ষে স্থান ত্যাগ সম্ভব নয়। আমার সাথে পাঁচ শতাধিক তান্ত্রিক চেলা (শিষ্য) রয়েছে। কেউ যদি তাঁর বেলায়তের শক্তিতে সকলকে বিতাড়িত করতে সক্ষম হন তবে আমি স্থান ত্যাগ করব।"

এ কথা শুনে হযরত সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী সদ্য বাইয়াত গ্রহণকারী মুরিদ জামালউদ্দিনকে ডেকে বললেন, "যাও, সে যত রকম যাদুই প্রদর্শন করুক না কেন সব গুড়িয়ে দাও এবং প্রয়োজনে যে কোন 'কারামত' প্রদর্শনের জন্য তোমাকে ক্ষমতা দেয়া হলো।" তিনি হযরতের কাছ হতে এ সাহস ও ক্ষমতা নিয়ে এগিয়ে গেলেন দৃপ্ত পদক্ষেপে। তান্ত্রিক একে একে তার শক্তি প্রদর্শন করতে থাকল, কিন্তু সব কিছু তৃণের মতো ভেসে গেল।

তান্ত্রিক প্রথমে পিঁপড়া ছাড়ল। হযরত জামালউদ্দিন দৃষ্টিবান নিক্ষেপ মাত্র সব গায়েব। তারপর সে বাঘের পাল নিয়ে আক্রমণে উদ্যত হলো, সে গুলোও ব্যর্থ হলো। শেষে সে স্বীয় বল্লমকে বাতাসে উড়াতে লাগল। হযরত জামাল উদ্দিন হযরতের লাঠি মোবারক আনিয়ে সেটাকে বাতাসের দিকে ছেড়ে দিলেন। হযরতের লাঠি তান্ত্রিকের

বল্লমটিকে মাটিতে নামিয়ে আনল। এভাবে তান্ত্রিক তার সব ক্ষমতাই প্রয়োগ করে ব্যর্থ হয়ে গেল। সে হযরতের কারামত দেখে হযরতের কদমে নিজকে সোপর্দ করল এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে হযরতের খেদমতে উৎসর্গিত হলো। তার পাঁচশত শিষ্যও তওবা করে ইসলাম গ্রহণ করে। এ স্থানের নামকরণ করা হয় 'রুহ আবাদ'। এস্থানে নির্মিত হলো (৭৬১ হিঃ সনে) একটি খানকা এবং হুজরা। পরবর্তীতে হযরত এখানেই স্থায়ীভাবে থেকেছিলেন এবং তাঁর মাজার শরীফও এখানে অবস্থিত। হযরত আবদুর রাজ্জাক নূরুল আইনের (রাঃ) মাজার শরীফও একই স্থানে। এটি বর্তমান ভারতের উত্তর প্রদেশস্থ ফয়েজাবাদ জেলার অন্তর্গত। আকবরপুর রেল ষ্টেশনের নিকটবর্তী বিশাখারী ও কাচওয়াচার মধ্যবর্তী স্থানসহ পুরা এলাকাটা আজ হেদায়তের প্রসূতিগাহ হিসাবে বিদ্যমান।

মাজার শরীফের অবস্থান

ফয়েজাবাদ থেকে ৮৪ কিঃ মিঃ পূর্বে এবং আজমগড় হতে চৌষট্টি কিঃ মিঃ পঁশ্চিমে দক্ষিণে এর অবস্থান। আকবর পুর হতে এর দুরত্ব সতের কিঃ মিঃ এবং বাসখারী বা বিশাখারী হতে এর দুরত্ব চার কিঃ মিঃ।

যে পুকুরটি তান্ত্রিকরা দখল করে ছিলো সেটিও সংস্কার করা হয়। হযরতের হায়াতকালেই তাঁর খেদমতে অবস্থানকারী আওলিয়াগণ নিজ হাতে এটি পুনঃখনন করেন এবং সাত বার জমজমের পানি দ্বারা পূর্ণ করা হয়। আজ এটি মহা বরকতময় একটি জ্বলন্ত কারামত হিসাবে সুপ্রসিদ্ধ। কঠিন পীড়াক্রান্ত লোকগণ এতে গোসল করে রোগমুক্ত হন এবং উদরের বিভিন্ন জটিল ও দূরারোগ্য পীড়ায় এর পানি অব্যর্থ হিসাবে প্রমাণিত।

সফরে হজ্ব

বেশ কিছুদিন হযরত আশরাফ জাহাঙ্গীর (রঃ) খানকা শরীফে অবস্থান করলেন এবং পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহের বিস্তৃত এলাকায় তাঁর দ্বীনি তালিম ও বরকতময় উপস্থিতিতে লোকজন উপকৃত হতে থাকল। বিশেষতঃ হযরত সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর (রঃ) উদ (অযোধ্যা), রুদূলী, সিধূর, জায়েস প্রভৃতি স্থানেও ইত্তেবসরে সফর করেন বলে অনুমিত হয়। প্রসিদ্ধ আলেম উলামা, সুফী - দরবেশ, আমির উমরাহগণও হযরতের অমূল্য সাহচর্য ও দয়া-দাক্ষিণ্য লাভে ধন্য হতে লাগলেন। কিন্তু হযরতের অন্তরে জেয়ারতে কাবার আকাংখা জাগল। তিনি সে জন্য তৈরী হলেন।

একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা

হযরত সমুদ্রপথে রওয়ানা হবার জন্য গুজরাটের সামুদ্রিক এলাকা যেখানে তখন সামুদ্রিক বন্দর হিসাবে অবস্থিত ছিল ঘোঘা কংবা ঘোম্বার্ত এর দিকে আসার পথে আহমেদাবাদে উপনীত হলে এখানকার শেখুল ইসলাম যিনি যুগশ্রেষ্ঠ আলেম ছিলেন, তিনি হযরতের সাথে সাক্ষাত করতে এলেন। মৌলানা সাহেব এক পর্যায়ে হযরতের সাথে শরয়ী' মসায়েল নিয়ে আলোচনায় রত হলেন। আলোচনাকালে মৌলানা সাহেব হযরতের শানে অপ্রাসঙ্গিক ও অন্যায় আক্রমণ করে বসলেন। এর ফলে হযরত চুপ হয়ে গেলেন।

শেখুল ইসলাম ফিরে গেলেন কিন্তু রাতে তিনি স্বপ্নে দেখতে পেলেন যে, একজন বুযর্গ ব্যক্তি তশরীফ আনলেন। তিনি শেখুল ইসলামের প্রতি তীব্র তিরস্কার করতে লাগলেন এবং বললেন, "নবী পাকের মহান বংশধর 'সৈয়দ' এর সঙ্গে উদ্ধতভাবে ঝগড়া করেছ আজ এজন্য তুমি চরম শাস্তির যোগ্য। কিন্তু তোমার পূর্বপুরুষগণের পূণ্যময় আত্মাসমূহ আজ তোমাকে রক্ষা করলেন বলে তাঁদের উসিলায় এ যাত্রা রক্ষা পেলে। এরপর আর কোন রকম অন্যায় আচরণ করলে তার জন্য যথেষ্ট ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। অতএব সাবধান!"

মৌলানা সাহেবের নিদ্রা ছুটে গেল। তিনি অত্যন্ত ভীত হয়ে গেলেন। অতি প্রত্যুষেই শহরের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে সাথে নিয়ে হযরতের কাছে এসে তাঁর পদপ্রান্তে লুটিয়ে পড়লেন এবং ক্ষমা চাইতে লাগলেন। হযরত তাঁকে ক্ষমা করে দিলেন। তিনি হযরতেরই হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন এবং পরবর্তীতে হযরত তাঁকে খেলাফত দানেও ধন্য করেছেন।

হযরত হজ্ব ও জেয়ারত সমাপন করে সমুদ্রপথে প্রত্যাবর্তন করে গুলবারগাহ নামক দাক্ষিণাত্যের একটি জনপদে কয়েকদিন অবস্থান করলেন। এখানকার জলবায়ু হযরতের খুবই ভালো লাগলো। এখানে পরে হযরত গীছু দারাজ (রঃ) এর খানকাহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এ গুলবারগাহ নামক স্থানে থাকাকালেই হযরত আশরাফ জাহাঙ্গীর **'গাউসুল আলম'** বা **'জগতের গাউস'** হিসাবে অভিষিক্ত হন।

মকামে গাউসুল আলমে অভিষিক্ত

রমজান মাসে গুলবারগাহ থাকাকালে একদিন হযরত তাঁবুর অভ্যন্তরে খাস কামরায় মোরাকাবা মোশাহাদায় রত ছিলেন। সাধারণতঃ এ খাস তাঁবুতে হযরত নূরুল আইন আবদুর রাজ্জাক ব্যতীত আর কেউ প্রবেশ করতেন না এবং কাউকে সেখানে আহবানও করতেন না। এক্ষণে হযরত সেই (আহমেদাবাদের পূর্বে বর্ণিত) শেখুল

ইসলামকে ডাকলে তিনি ভিতরে প্রবেশ করলেন, কিন্তু হযরতের অবস্থা দেখে ভড়কে গেলেন। তিনি কথা বলতে সাহস করলেন না, বিচলিত অবস্থায় বাইরে চলে এলেন।

হযরত তখন অতি অস্বাভাবিক অবস্থায় ছিলেন। তাঁর মুখ নিসৃত দুর্বোধ্য বহু আওয়াজও ভেসে আসছিল। হযরতের অন্যান্য সঙ্গী সাথীও সকলে উদ্বিগ্ন চিত্তে তাঁবুর বাইরে ছিলেন। শেখুল ইসলাম তাঁদেরকে হযরতের অবস্থার কথা জানালেন কিন্তু এরপরও কেউ ভিতরে প্রবেশ করে হযরতের সাথে কথোপকথন করার জন্য সাহস পাচ্ছিলেন না। ক্রমে রাত বাড়তে লাগল। হঠাৎ সকলে শুনতে পেলেন হযরতের আওয়াজ -- তিনি বলছেন, "আলহামদুলিল্লাহ! প্রাপ্তি ঘটেছে।"

তখন সবার পক্ষ হতে হযরত 'নূরুল আ্ইন' অতি বিনীতভাবে হযরতের সমীপে, অস্বাভাবিক ও আশ্চর্যময় অবস্থা সম্পর্কে জানানোর জন্য আবেদন জানালেন। হযরত বললেন, **"আজ রজব মাসের ১লা তারিখ, সন ৭৭০ হিজরী।** আধ্যাত্ম জগতের সর্বোচ্চ আসনে সমাসীন গাউসে জমান বা 'যুগের গাউস' আজ ইন্তেকাল করেছেন। সকল অলি দরবেশের একান্ত আকাংখা থাকে সে পদে যেন খোদা তায়ালা তাঁকে মনোনীত করেন। কিন্তু খোদার অশেষ বেশুমার শোকর যে, এ অতুলনীয় মর্যাদার মুকুট তিনি এ অধমের ভাগ্যে প্রদান করেছেন। নিয়মানুযায়ী গাউসের নামাজে জানাজা গাউস হিসাবে আমিই পড়িয়েছি এবং জানাজা আমি ও 'আবদুর রব' 'আবদুল মালেক'এবং 'আওতাদ' স্তরের একজনসহ মোট চারজনে কাঁধে তুলেছি।"

হযরত আশরাফ জাহাঙ্গীর (রঃ) আরো বললেন, "ইতিপূর্বে আমার পদমর্যাদা ছিল 'আবদুল মালিক' হিসাবে এবং গাউছে জমানার বাম পার্শ্বে আমার অবস্থান ছিল। আজ আমি 'গাউস' হিসাবে অভিষিক্ত হওয়ায় 'আবদুর রব' পদমর্যাদাধারী 'আবদুল মালিক', 'আওতাদ' হতে একজন বুযর্গকে 'আবদুর রব', 'আবদাল' হতে একজনকে 'আওতাদ', 'আখইয়ার' হতে একজনকে 'আবদাল', 'আবরার' হতে একজনকে 'আখইয়ার', 'নজবা' হতে একজনকে 'আবরার', 'নকবা' হতে একজনকে 'নজবা' এবং সাধারণ পূন্যবান মুসলমান হতে একজনকে 'নকবা' পদে উন্নীত করা হয়েছে।"

ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

(এটা আল্লাহরই দয়া, তিনি যাকে চান দান করেন। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ অতিশয় দয়াবান ও মহান)।

সত্যিই হযরত আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী (রঃ) আজ এক মহান রোতবা হাসিল করেছেন খোদায়ী অনুগ্রহের ফলশ্রুতিতে। বেলায়তের পদ মর্যাদায় নবুয়তের মকামের

পর এটিই সর্বোচ্চ মর্যাদা আজ সে মর্যাদা। গাউসিয়তের মকাম তিনি লাভ করেছেন। এটা পরম সৌভাগ্য তাঁর, যিনি একদা খোদার অনুগ্রহ ও সান্নিধ্য লাভের প্রত্যাশায় খোদায়ী পথে চলার তাড়নায় প্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণ বশীভূত, আত্মাকে সম্পূর্ণ সমর্পিত করে রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করে ফকিরী বেশ গ্রহণ করে নিয়েছিলেন, আজ সিমনান কেন সারা সৃষ্টিই তাঁর হাতের মুঠায় এসে গেল এবং যুগের সব কিছু তাঁর ইচ্ছাধীন হয়ে তাঁর কাছে হাত পেতে বলতে শুরু করল-

"এয়া সাইয়েদ আশরাফ জাহাঙ্গীরঃ দস্তে মন জার ও না তাওয়াঁগীর" অর্থাৎ ঃ

"ওহে সৈয়দ, ওহে হযরত জাহাঁগীর ঃ হাত পেতেছে তোমারই কাছে জয়ীফ ও ফকির।"

জগত তাঁকে আখ্যায়িত করল 'গাউসুল আলম' হিসাবে। এর কিছুদিন পর তিনি স্বীয় খানকা শরীফে প্রত্যাবর্তন করেন।

পুনরায় সফর ও রোমে অবস্থান

কিছুদিন পর হযরত পুনরায় সফরে যাওয়ার ইচ্ছা করলেন। তিনি বিভিন্ন স্থান হয়ে রোমে (ইতালী) পৌছেন এবং হযরত মাওলানা জালালুদ্দিন রুমী (রঃ) এর প্রতিষ্ঠিত আস্তানায় তশরীফ নিয়ে গেলেন। হযরত জালাল উদ্দিন তখন ইহজগতে ছিলেন না। তবে খানকার তত্ত্বাবধায়ক এবং গদিনশীন যিনি ছিলেন হযরতকে অত্যন্ত সমাদর করলেন। একদিন তিনি হযরত গাউসুল আলমের সম্মানে এক বিরাট ভোজের আয়োজন করলেন। বহু মশায়েখ ও আলেমও আমন্ত্রিত হলেন, যাঁদের মধ্যে রোমের শেখুল ইসলামও উল্লেখযোগ্য। কিন্তু গাউসুল আলম সম্পর্কে তার ধারণা ভাল ছিলনা এবং তাঁর সম্পর্কে বিভিন্ন মন্তব্য করেন, যা গীবতের পর্যায়ে পৌছে।

কারামত

এ শেখুল ইসলামের ইলমী পাণ্ডিত্য বলার অপেক্ষা রাখেনা। তিনি মনে ভাবলেন, গাউসুল আলম হযরত মখদুম জাহাঙ্গীরকে এমন কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব, যাতে তিনি উত্তর দিতে অপারগ হয়ে সবার সামনে অপদস্ত হন। এসব ভাবতে ভাবতে তিনি খানকায় উপস্থিত হলেন। আমন্ত্রিত অতিথিদের সকলে আসার আগে হযরত খাবার ঘরে এলেন না। যখন সবাই এসে পৌছেন তখন স্বীয় কামরা হতে বের হয়ে খাবার ঘরের বাইরে পৌছেন কিন্তু ঘরে না ঢুকে বাইরে দাঁড়িয়ে পড়লেন। সকলে সেদিকে তাকাতেই ঘটল আজব ব্যাপার।

সবিস্ময়ে সকলে দেখতে লাগলেন হযরত গাউসুল আলমের শরীর মোবারক হতে অপর একটি শরীরের সৃষ্টি হচ্ছে যা তাঁরই হুবহু প্রতিকৃতি কিন্তু শরীরটি সচল ও

জীবন্ত। সেটা থেকে অপর একটি, সেটি হতে আরো, আরো এবং এভাবে একশতটির মতো সচল প্রতিকৃতি সৃষ্টি হলো। সাহেবে খানকা এগিয়ে এসে গাউসুল আলম হযরত সৈয়দ মখদুমকে অতি সম্মানের সাথে ভিতরে নিয়ে গেলেন এবং বিশেষ আসনে উপবেশন করালেন। তিনি তৎপর শেখুল ইসলামের দিকে ফিরে তাঁকে বললেন, 'আপনি কোন প্রতিকৃতিটি হতে আপনার প্রশ্ন জানতে চাইবেন?' শেখুল ইসলামতো প্রথমেই অবস্থা দেখে কাহিল, তার উপর হযরতের এরূপ কথায় তাঁর আপাদমস্তক যেন কেঁপে উঠল। তিনি হযরতের কাশফ দেখে একেবারে ভড়কে গেলেন। তড়িৎ উঠে এসে হযরতের পায়ে পড়লেন। অন্যান্যরাও তাঁর হয়ে হযরতকে সুপারিশ করতে থাকলে তিনি তাঁকে মাফ করে দিলেন। তবে ঘটনা এতটুকুতেই শেষ নয়। পরদিন ফজর নামাজান্তে হযরত অজিফা পাঠে রত ছিলেন এমন সময় শেখুল ইসলাম আলুথালু বেশে এসে হযরত হতে বারংবার মাফ চাইতে লাগলেন। কারণ জিজ্ঞাসিত হলে বলেন, রাতে শেখুল ইসলাম ছাদের উপর ঘুমানোর আয়োজন করছিলেন। হঠাৎ দশজন অচেনা লোক নাঙ্গা তলোয়ার নিয়ে উদয় হন। তাঁদের একজন শেখুল ইসলামের বুকে চড়ে বসলেন এবং বললেন, 'তুমি গাউসুল আলম সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানীর গীবত করেছ, আমরা তোমার গর্দান উড়িয়ে দেব।' সে সময় একজন অতি নূরানী চেহারাধারী বুযর্গ লোক সেখানে আগমন করলেন এবং তাঁদেরকে বললেন যে, তিনি গাউসুল আলম হতে এ ব্যাপারে আমার হয়ে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন। সুতরাং আমাকে ছেড়ে দেয়া হোক।

তিনি বলেন, 'তাঁরা চলে গেলে উক্ত বুযর্গ ব্যক্তি আমাকে খুব তিরস্কার করেন এবং সাবধান করে দিয়ে বলেছেন আল্লাহর অলিগণের ব্যাপারে যেন মাথা না দেই এবং আগামীতে কোন প্রকার বেয়াদবী যেন আর না হয়। তাছাড়া সকালেই তিনি আমাকে হযরত হতে ক্ষমা চেয়ে নিতে বললেন।

এ ঘটনা শুনে হযরত হেঁসে উঠলেন এবং বললেন, 'মাওলানা! ঐ বুযর্গ নূরানী চেহারা বিশিষ্ট লোক হলেন তোমারই পূর্বপুরুষ। তিনি কাশফ ও কারামতধারী অলি ছিলেন। ভবিষ্যতে তাঁর পরামর্শ কখনো ভুলবে না। সুফী ফকিরগণের প্রতি কখনো বিরূপ ধারণাও করবে না।' শেখুল ইসলামকে অবশেষে হযরত ক্ষমা করে দিলেন।

রোম হতে প্রত্যাবর্তন

হযরত রোমে কিছুদিন অবস্থানের পর পুনরায় সফর শুরু করেন। তিনি সফরের এক পর্যায়ে ফিলিস্তিনে তশরীফ আনেন। এখানে তিনি বায়তুল মোকাদ্দাস এবং অন্যান্য

ঐতিহাসিক বরকতময় স্থান ও আম্বিয়া কেরামের মাজার সমূহের জেয়ারত করেন। ফিলিস্তিনের অন্যান্য নগর ও জনপদেও হযরত গাউসুল আলম সফর করেন এবং বহুলোক তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করে। এখান হতে হযরত পুনরায় হজ্বে বায়তুল্লাহর জন্য মক্কা শরীফ আসেন এবং হজ্ব সমাপন করেন। অতঃপর মদীনা মোনাওয়ারায় হাজিরা দিতে তৎকালীন শাম অভিমুখে রওয়ানা দেন।

ইবলিশের কৈফিয়ত

তিনি তূরে সিনা বা সিনা পর্বতেও গমন করেন এবং এ সময় হযরত খিজির (আঃ) তাঁর সাথে ছিলেন। সিনা পর্বতে হযরতের সাথে ইবলিশের (আলাইহে লা'নাতুল্লাহ) সাক্ষাত হয়। হযরত তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি হযরত আদম (আঃ)কে সেজদা কেন করনি? সে উত্তরে বলল, আমি খোদার একজন সত্যিকার প্রেমিক। আদম (আঃ)-কে সেজদা করার মধ্যে শিরক এর দূর্গন্ধ আসে। তাওহীদ সম্পর্কে আমার চেতনা খোদা ব্যতীত অন্য কাউকে সেজদা করাকে সমীচীন মনে করেনি। হযরত গাউসুল আলম তাকে বললেন, তুমি আদমকে সেজদা করার গুঢ় রহস্যই বুঝতে পারনি তাই এতবড় ভুল করেছ। স্বভাবতঃ ভালোবাসার দাবী হচ্ছে মাহবুববের আদেশকে নিজ ধারণা ও বুদ্ধি দিয়ে ভালোমন্দ বিশ্লেষণ করবেনা। নিজের অনিচ্ছাই মাহবুবের ইচ্ছা হলে মাহবুবের সন্তুষ্টির খাতিরে সেটাই করা উচিৎ। এরই নামতো সত্যিকার ভালোবাসা।

শাম হতে পারশ্য

হযরত 'শাম' প্রদেশ হতে পারশ্য রাজ্যে প্রবেশ করেন। তখন সিরাজ-এ বিখ্যাত কবি ও সাধক হযরত হাফেজ সিরাজী জীবিত ছিলেন। হযরতের তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হয় এবং এখানে হযরত বেশ কিছুদিন অবস্থান করেন। সিরাজ হতে 'কাশান' গমন করেন। সেখানে শেখ আবদুর রাজ্জাক (রাঃ) এর সঙ্গে মোলাকাত করেন এবং কয়েকদিন অবস্থান করেন। শেখ আবদুর রাজ্জাক প্রায়শঃ বিভিন্ন বিষয়ের উপর খোদায়ী পথের অন্বেষণকারী ফকির-দরবেশদের ওয়াজ নসিহত করতেন। হযরত গাউসুল আলম বলেন, 'আমিও মধ্যে মধ্যে সেখানে শরীক হতাম। একদিন আমি 'ফতুহাতে মক্কিয়াহ' নামক কিতাবের একটি খন্ড এবং 'এসতেলাহে কবীর' নামক কিতাব হতে একটি খন্ড হযরতের কাছে পেশ করেছিলাম বয়ান করার জন্য।'

শেখ আবদুর রাজ্জাক এর একথা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, তিনি বলতেন, "খোদায়ী পথের অন্বেষণকারী যতক্ষণ পর্যন্ত ফকির দরবেশগণের নিজস্ব ব্যবহারিক ভাষা ও শব্দ

এবং সুফীয়ায়ে কেরামের হাকীকত সম্পর্কে ব্যাপকভাবে অবগত না হবে, ততক্ষণ শীর্ষস্থানীয় মশায়েখগণের বাণী-মন্তব্য ও তাঁদের লিখিত সংকলন সমূহ নিয়ে মুস্কিলে পড়তে হবে এবং সুফীগণের উচ্চতর মর্যাদা কখনো সে লাভ করতে সক্ষম হবে না।"

মাতৃভূমি সিমনানে

মাতৃভূমি সিমনানেও তিনি আগমন করেন। তাঁর মহিয়ষী আম্মাজান তখন জীবিত ছিলেন না। ভাই সৈয়দ মোহাম্মদ আরাফ যাঁর হাতে তিনি মসনদ ছেড়ে এসেছিলেন, তখন মসনদে আসীন। তিনি গাউসুল আলম হযরত সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীরকে পেয়ে কি যে খুশী হলেন তা ভাষায় প্রকাশের নয়। পারিষদবর্গ এবং রাজ্যের সকলেই হযরতের আগমনে অত্যন্ত খুশী হলো। রাজ্যময় খুশী আর আনন্দের ঢল নামল।

এখান হতে তিনি স্বীয় নানাজান হযরত খাজা আহমদ বসভী (রঃ) এর আস্তানায় (কৃষ্ণ সাগরের নিকটবর্তী এলাকা যা তুরস্কের অন্তর্ভুক্ত) গমন করেন। তখন আস্তানার গদিনশীন ছিলেন হযরত আহমদ বসভীর সন্তান। তিনি হযরতকে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করে কুশলাদি এবং অন্যান্য আলোচনা করেন। বিশেষতঃ তিনি হযরত আবদুর রাজ্জাক নূরুল আইনের পরিচয় নিলেন এবং তাঁর জন্য দোয়া করলেন। হযরতকে বসভী সিলসিলার জিকির আজকার ইত্যাদি প্রতিপালনের অনুমোদন দেয়া হয়। তিনি এখানে তুর্কী ভাষাতে স্থানীয় লোকদের হেদায়তের লক্ষ্যে ওয়াজ নাসীহত করেন। তাঁর ওয়াজের ফলে বহু লোক পাপ কর্ম হতে তাওবা করল, অনেকে হযরতের সাথে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে ঘরবাড়ী পরিত্যাগ করল। এভাবে বসভী খানকায় কিছুদিন অবস্থান করেন।

তিনি হযরত খাজা মওদুদ চিশতী (রঃ) এর মাজার এবং খানকাতেও গমন করেন। সেখানকার তত্ত্বাবধায়ক ও ভারপ্রাপ্ত শেখের সঙ্গেও তাঁর মোলাকাত হয়। হযরত সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানীর সঙ্গে নক্সবন্দী তরীকার বিখ্যাত শেখ হযরত বাহাউদ্দিন নক্সবন্দী (রঃ) এর মোলাকাত হয়। তিনি হযরত নূরুল আইনকে বিশেষ দোয়া ও স্নেহ করলেন এবং খাস তাওয়াজ্জুহ দানে ধন্য করলেন।

কারামত

অতঃপর হযরত বলখ গমন করেন। ওখান হতে শেরওয়ান যান। সেখানে একটি মসজিদে হযরত অবস্থান করছিলেন। সেদিন শেরওয়ানে প্রচণ্ড তুষারপাত হচ্ছিল এবং তাপমাত্রা খুব নীচে নেমে গিয়েছিল। লোকজন ঘরের বাইরে যাওয়ার কথা চিন্তাও করতে পারেনা। গরম কাপড়ে ঢেকে সকলে নিজ নিজ ঘরের মধ্যে। এ অবস্থায়

হযরতের সাথের কামাল নামক এক মুরিদ প্রাকৃতিক কর্ম সারার জন্য মসজিদ হতে বাইরে বের হলেন। তিনি মসজিদ হতে সামান্য দূরে একস্থানে গিয়ে যে বসলেন, আর উঠার অবকাশ পেলেন না। বসাবস্থায় সেখানেই তাঁর চারদিকে তুষার জমে উঠতে লাগল।

এ সময় হযরত অজু করছিলেন। হঠাৎ সকলে খেয়াল করলেন যে, হযরত অস্বাভাবিক ঠাণ্ডায় আক্রান্ত হয়ে পড়েছেন। সারা শরীর ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছিল। সকলেই এ অবস্থা দেখে ভীত হয়ে গেলেন। বদ্ধ কামরা, আগুন জ্বলছে এবং প্রয়োজনীয় শীত নিবারক জামাও পরিধানে, তা সত্ত্বেও এ অবস্থার কারণ তাঁরা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। অবশেষে একজন কাশফ-এর অধিকারী দরবেশ বুঝলেন যে, স্বীয় খাদেমগণের মধ্যে কারো কষ্টের ভার হযরত স্বীয় শরীর মোবারকের উপর উঠিয়ে নিয়েছেন। অতএব সে খাদেম কে, তাই খুঁজে দেখা দরকার।

অবশেষে দেখা গেল কামাল সবার মধ্যে অনুপস্থিত। তখন সকলে তাঁর খোঁজে চারদিকে বের হলেন এবং দেখতে পেলেন যে, কামাল একস্থানে বেহুঁশ হয়ে পড়ে রয়েছেন এবং তাঁর শরীর বরফে ঢাকা পড়ে যাওয়ার উপক্রম। তাড়াতাড়ি সকলে ধরে তাঁকে ভিতরে নিয়ে গিয়ে সেবা শুশ্রূষা করে সুস্থ করে তোলার পর হযরতের শরীর মোবারকের সে কষ্টও দূরীভূত হলো। সত্যিই আল্লাহর পবিত্রতা কি বয়ান করা যায়? অপরের শরীরের যাতনার ভার নিজ শরীরে তুলে নিয়ে আল্লাহর ওলী জীবিত রাখলেন তাঁকে!

তৈমুর লং

হযরত হিরাতেও আগমন করেছিলেন বলে জানা যায়। সেখান হতে তিনি বাগিস্তানে আসেন। অসংখ্য তুর্কী ও উজবুক হযরতের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। এ সময় তুরস্ক ছিল বিশ্বখ্যাত দ্বিগ্বিজয়ী তৈমুর লং এর অধীন। সমরকন্দ ছিল রাজধানী। সম্রাটের কাছে কোন কোন আমির উমরাহ হযরত গাউসুল আলম সম্পর্কে বিরূপ ধারণা দিয়ে সম্রাটের কানভারি করার অপচেষ্টা চালায়। তারা বলে যে, ইনি সিমনানের শাহজাদা। দরবেশের ছদ্মবেশে এ এলাকায় উদ্দেশ্যমূলকভাবে ঘুরাফিরা করছেন। অসংখ্য তুর্কী এবং উজবুক তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছে। আরো শক্তি সঞ্চয় করে ইনি একদিন সম্রাটের জন্য বিপদ হয়ে দেখা দেবেন। কিন্তু তৈমুর লং সংবাদ নিয়ে জানলেন যে, উমরাহগণ যাঁর কথা বলছেন, তিনি তো সেই মহান অলি হযরত সৈয়দ সুলতান

আশরাফ জাহাঙ্গীর! সম্রাট ইতোপূর্বেই তাঁর সাক্ষাৎ লাভের সৌভাগ্য লাভ করেছেন। অতএব তিনি নিশ্চিন্ত হলেন।

বরঞ্চ সম্রাট একজন নির্ভরযোগ্য প্রতিনিধি মারফত হযরতের খেদমতে প্রচুর তোহ্‌ফা ও উপঢৌকন প্রেরণ করে হযরতের দোয়া প্রার্থনা করলেন। হযরত সমস্ত উপঢৌকন ও মূল্যবান সামগ্রী দরবারে উপস্থিত ফকির দরবেশগণকে বিলিয়ে দিলেন।

জালাউদ্দিন বুখারী জাহানিয়া জাহাঁ গাশত (রঃ)

দীর্ঘ সফর ও ভ্রমণ করে বিভিন্ন ইসলামী দেশ ও জনপদ ঘুরে হযরত সিন্ধু হয়ে ভারত বর্ষে পদার্পন করলেন। তিনি 'উঝ' নামক নগরে এসে হযরত মাখদুম সৈয়দ জালাল উদ্দিন বুখারী জাহানিয়া জাহাঁ গাশত এর খানকা শরীফে উঠলেন। তাঁর সম্পর্কে ইতোপূর্বে আলোচনা এসেছে। তিনি হযরতকে প্রথম বারের মতোই অত্যন্ত আন্তরিক সমাদর করলেন। তিনি কাদেরিয়া সিলসিলার সমস্ত নেয়ামতসহ কাদেরিয়া সিলসিলার খেলাফত এবং অনুমতিও হযরতকে প্রদান করেন। উল্লেখ্য যে, এ জন্যই আশরাফিয়া সিলসিলায় কাদেরিয়া তরিকার সংমিশ্রণ লক্ষ্যণীয়। তাঁরই বদৌলতে কাদেরীয়া সিলসিলার পরম্পরা হযরত পীরানে পীর দস্তগীর, গাউসুল আজম হযরত শাহ আবদুল কাদের জিলানী (রঃ) পর্যন্ত আশরাফিয়া সিলসিলায় সন্নিবেশিত হয়েছে।

এখান থেকে গাউসুল আলম হযরত সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর দিল্লী গমন করেন এবং সুলতানুল মশায়েখ হযরত নিজামুদ্দিন মাহবুবে এলাহী (রঃ) এর মাজারে হাজির হন। তৎপর হযরত কুতুবুদ্দিন বখতেয়ার কাকী (রঃ) এর দরবারে পৌঁছে জিয়ারত করেন এবং বিভিন্ন স্থানাদি ঘুরে কাচওয়াচা শরীফ প্রত্যাবর্তন করেন।

হিন্দুস্থানে ফিরে আসার পর তিনি আরো একবার গুজরাট এবং দক্ষিণে (দাক্ষিণাত্য) সফরে যাওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রথমে গুজরাট এবং পরে দাক্ষিণাত্যে আসার কথা বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়। বিশেষতঃ তিনি গুলবারগাহ শহরে দ্বিতীয়বার আগমন করেন। এ সময় এখানে হযরত খাজা সৈয়দ মীর মোহাম্মদ গীছুদারাজ (রাঃ)[১] অবস্থান করছিলেন। উভয় বুযর্গ পরস্পরের সাথে সাক্ষাত করলেন। এখানে হযরত গাউসুল আলম চার মাস অবস্থান করেন।

---

(১) এ মহান বুযর্গেরই এক অধস্তন বংশীয় পরম্পরা আজ পাকিস্তানের হাজারা জেলার ছিরিকোট দরবার শরীফ রওনক করে আছেন। হযরত সৈয়দ আহমদ ছিরিকোটি (রাঃ) এবং হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ তৈয়ব শাহ (রাঃ) এ বংশেরই জগদ্বিখ্যাত দুই দ্বীনি ব্যক্তিত্ব।

মাহবুবে ইয়াযদানী লকব

হিজরী ৭৮২ সনের রমজানুল মোবারকের ২৭ তারিখের রাত। শবে কদরের বরকতময় রজনী। হযরত গাউসুল আলম স্বীয় খানকায় অবস্থানরত ছিলেন। সকল শীর্ষস্থানীয় খলীফা ও মুরিদগণ উপস্থিত ছিলেন। সকলে বিনিদ্র এবাদতে রত। ফজর হওয়ার কিছুক্ষণ পূর্বে সকলেই শুনতে পেলেন গায়বী কণ্ঠস্বর ঘোষণা করছে- "আশরাফ হচ্ছে আমার মাহবুব।" অদৃশ্য কণ্ঠের এ ঘোষণা সকলেই শুনলেন এবং বুঝলেন, যিনি খোদার মোহাব্বতে কৈশোরের দুরন্তপনাকে অবহেলা করেছেন, রাজসিংহাসন পায়ে ঠেলেছেন, আত্মীয় পরিজন দূরে সরিয়েছেন, অবর্ণনীয় ত্যাগ আর কষ্ট স্বীকার করেছেন আজ তাঁর জন্য স্রষ্টার পক্ষ থেকে এ পুরস্কার ও স্বীকৃতি। مَن يحب الله يحبه الله অর্থাৎ আল্লাহকে যে ভালবাসেন তিনি আল্লাহর মাহবুব বা প্রিয়জনে গণ্য হন। এ দিন হতে হযরত গাউসুল আলম **'মাহবুবে ইয়াযদানী'** খেতাবেও পরিচিতি লাভ করলেন।

কারামত

হযরতের একটি প্রাত্যহিক কারামত ছিল যে, ফজর নামাজ মক্কা মোকাররমায় আদায় করতেন। সে শবে কদরের পরদিনও ফজর নামাজ আদায় করলেন হারাম শরীফে। সে সময় সেখানে হযরত শেখ নাজমুদ্দিনসহ অন্যান্য বিখ্যাত পাঁচ শতাধিক দরবেশ উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা হযরতকে দেখে তাঁকে 'মাহবুবে ইয়াযদানী' উপাধি লাভের সৌভাগ্যের জন্য মোবারকবাদ জানালেন। এরপর থেকে হযরত গাউসুল আলম যেখানেই যেতেন, মশায়েখগণ তাঁকে মাহবুবে ইয়াযদানী হিসাবে স্মরণ করতেন।

পুনর্বার মুর্শিদের দরবারে

হযরত আবার পীর ও মুর্শিদের আস্তানায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং পাণ্ডুয়া যাওয়ার পথে বিহারের হযরত শরফুদ্দিন ইয়াহিয়া মুনিরী (রাঃ) এর দরবারে উপস্থিত হলেন। তিনি যখন বিহারের পথে তখন হযরত ইয়াহিয়া মুনিরী (রঃ) এর অন্তিম মূহুর্ত উপস্থিত। তিনি আপনজনদের ডেকে বললেন, "তোমরা আমার ইন্তেকালের পর জানাজা পড়ার আগে একটু অপেক্ষা করবে। কেননা একজন আওলাদে রাসুল, বাদশাহী পরিত্যাগকারী, হাফেজ ও আলেম সহসা এখানে আসছেন, তিনিই নামাজের ইমামতি করবেন। তাঁর জন্য অপেক্ষা করো।" বস্তুতঃ হযরত ইয়াহিয়া মুনিরী

জানতেন হযরত গাউসুল আলম আসছেন এবং উভয় উভয়কে দেখার জন্য উদগ্রীবও ছিলেন। কিন্তু আল্লাহর ফয়সালা মোতাবেক হযরত মুনিরী (রঃ) হযরত আশরাফ জাহাঙ্গীর আসার পূর্বেই ইন্তেকাল করলেন। (হিজরী ৭৮২ সন)

হযরত ইয়াহিয়া মুনিরী (রঃ) এর ওফাতের পর তাঁর গোসল ও কাফন দিয়ে সকলে হযরতের অসিয়ত মোতাবেক হযরত সুলতান আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী (রঃ) এর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। অপেক্ষা করতে করতে হযরত ইয়াহিয়া মুনিরী (রঃ) এর বিশিষ্ট খাদেম শেখ চৌলহায়ী শহর হতে বাইরে তাঁদের শেখ কথিত ব্যক্তির তালাশে বের হয়ে তাঁকে আসতে দেখতে পেলেন। দেখা মাত্র শেখ চৌলহায়ী আধ্যাত্মিক চোখ দিয়ে হযরতকে চিনতে পারলেন; তবুও পরিচয় জিজ্ঞাসা করে জেনে নিলেন তিনি সৈয়দ, আলেম ও হাফেজ কিনা। পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে তিনি হযরতকে তাজিমের সাথে খানকায় নিয়ে আসলেন।

হযরত আশরাফ জাহাঙ্গীর (রঃ) এখানে পৌছে হযরত ইয়াহিয়া মুনিরীর (রঃ) খলীফা এবং সহচরগণের সাথে মিলিত হলে সকলে হযরতকে জানাজার নামাজ পড়ানোর ব্যাপারে হযরত মুনিরীর শেষ ইচ্ছার কথা তাঁকে অবহিত করেন এবং নামাজ পড়ানোর অনুরোধ জানালেন। হযরত আশরাফ নামাজ পড়ালেন।

এদিকে নামাজ আদায়ের শেষে হযরতকে মাজার শরীফে শায়িত করে মাটি দেয়ার কিছুক্ষণ পর দেখা গেল হযরত ইয়াহিয়া মুনিরী (রঃ) এর কবর হতে তাঁর একখানা হাত বাইরে বেরিয়ে এসেছে। এটা দেখে শেখ মুনিরীর খলিফা এবং সহচরগণ খুব চিন্তিত হলেন, এর কারণ কিছুতেই তাঁরা নির্ণয় করতে পারলেন না। একে অন্যকে জিজ্ঞাসা করেন কিন্তু কেউ জবাব দিতে পারলেন না। অবশেষে হযরত আশরাফ জাহাঙ্গীর (রঃ) কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি এরশাদ করলেন, "হযরত ইয়াহিয়া মুনিরী (রঃ) অদৃশ্য পবিত্রাত্মা (মরদানে গায়ব) হতে একটি 'তাজ' (মুকুট) লাভ করেছিলেন। তিনি অসিয়ত করেছিলেন যেন সেটা তাঁর সাথে কবরে দেয়া হয়। সম্ভবত তোমরা সেটা বিস্মৃত হয়েছ। তিনি এখন সেটাই চাইছেন।" এ জবাব শুনে সকলে সে কথা স্বীকার করলো এবং একজন সে মুকুট এনে হযরতের হাতে দেয়া মাত্র মুকুটসহ হাত পুনরায় কবর শরীফে ঢুকে গেল।

এখানে তিনি রাত অতিবাহিত করলেন মাজার শরীফে বসেই । অতঃপর পাণ্ডুয়া রওয়ানা হন। শেখ মুনিরীর জানাজার পর হযরত গাউসুল আলম এর হৃদয়ে স্বীয় মুর্শিদের জন্য কিরূপ ভাবাবেগ সঞ্চারিত হয়েছিল তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। কারো

পক্ষে তাঁর সে অবস্থা উপলব্ধি করাও সম্ভব নয়। প্রচণ্ড আবেগ মথিত উঠে আসা অন্তরের সে টান ও ভালোবাসা নিয়ে অবশেষে হযরত স্বীয় মুর্শিদের দরবারে হাজির হন। সম্ভবত এটাই হযরতের সাথে শেষ সাক্ষাত ছিল। কিছুদিন মুর্শিদের খেদমতে অবস্থানের পর তিনি স্বীয় খানকায় প্রত্যাবর্তন করেন।

পীর ও মুর্শিদের ওফাত

হিজরী ৮০০ সনে হযরত আলাউল হক গানজেনাবাত ওফাত প্রাপ্ত হন। সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে অবিলম্বে হযরত গাউসুল আলম পাণ্ডবে পৌছেন। শীর্ষস্থানীয় আউলিয়া কেরামদের অনেকে তখন খানকা শরীফে উপস্থিত। হযরত গাউসুল আলম সবার উপস্থিতিতে পীরজাদা মোহাম্মদ নূরকে খানকায় পিতার স্থলাভিষিক্ত করলেন এবং বললেনঃ আজ সুফীগণের মধ্যে 'বাংলার কুতুব' পদটি শূন্য হয়েছে বিধায় পূরণ করা প্রয়োজন। সে পদে আমার পীরজাদা হযরত মোহাম্মদ নূরকে অধিষ্ঠিত করা হলো।

একথা শুনে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের কেউ কেউ বললেন যে, এর প্রমাণ কি? তখন মাহবুবে ইয়াযদানী গাউসুল আলম হযরত সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর হযরত মোহাম্মদ নূরের দিকে ফিরে তাঁকে বললেন, 'দেখ, দূরের যে পাহাড়টি দেখা যাচ্ছে, সে পাহাড়কে হুকুম কর সে যেন এখানে আসে।' সত্যিই হযরত মোহাম্মদ নুর বলা মাত্র পাহাড়টি স্থানচ্যুত হয়ে এগিয়ে এল। এটা দেখে উপস্থিত সকলে মেনে নিলেন যে, ইনিই এখন বাংলার কুতুব। হযরত মোহাম্মদ নূর সেদিন থেকে **নূর কুতুবুল আলম** হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

হযরত মাহবুবে ইয়াযদানী পাণ্ডবে কিছুকাল অবস্থানের পর কাচওয়াচা শরীফের পথে রওয়ানা হলেন। প্রথমে তিনি জৌনপুর এসে এখানকার জামে মসজিদে অবস্থান নিলেন। এ সময় জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহীম শর্কি এখানকার নৃপতি।

ইব্রাহীম শর্কী ও জৌনপুর

তিনি সুফী দরবেশদের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তিনি বিচক্ষণ পরাক্রমশালী ও প্রজাহিতৈষী নৃপতি ছিলেন। তাঁর সেনাপতি ছিলেন কেশর খান (যিনি খুলনার খান জাহান আলী (রঃ) নামে পরিচিত) রাজা গনেশকে দমন করার জন্য হযরত নূরে কুতুবে আলম (রঃ) এর অনুরোধে ইব্রাহিম শর্কী সেনাপতি কেশর খানের নেতৃত্বে বিরাট সেনাদল পাঠিয়েছিলেন এবং গনেশকে পরাজিত করেন। তিনি গনেশের পুত্র

যদুকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে সিংহাসনে আরোহন করান। ইতিহাসখ্যাত এ ঘটনা সকলেই জানেন। কেশর খান বাল্যকালে নূরে কুতুবে আলমের কাছে পাঠ শিখেন ও পরে মুরীদ হন। অতি উদারতা ও জনকল্যানকামিতা তাঁকে মহীয়ান করে রেখেছে। তিনি একজন উচু মর্যাদার অলিও ছিলেন। পরবর্তীতে খুলনার সুন্দরবন অঞ্চলে জঙ্গল ও জলাশয় পরিস্কার করে তিনি নতুন বসতি স্থাপন করেন।

হযরত সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর জৌনপুর জামে মসজিদে এসে অবস্থান করতে থাকেন। তাঁর আগমন সংবাদ শুনে বাদশাহ স্বয়ং তাঁর সাক্ষাত লাভের জন্য সেখানে গমন করেছিলেন। বাদশাহর সঙ্গে ছিলেন শেখুল ইসলাম হযরত কাজী শেহাব উদ্দিন। হযরত শেহাব উদ্দিন হযরত জাহাঙ্গীর (রঃ) এর প্রতি অসামান্য শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করেন যাতে হযরত বড়ই খুশী হয়েছিলেন। হযরত তাঁর সম্পর্কে স্বীয় মন্তব্যে বলেন যে, এত বড় পণ্ডিত সারা ভারতে দেখেননি। তবুও তিনি হযরতের কাছে ছিলেন নিতান্ত ভক্তিপদ, শ্রদ্ধাবনত। তিনি হযরতের কাছে স্বীয় পাণ্ডিত্য বিনীত ভাবে তুলে ধরেন। পরে হযরত তাঁকে খেলাফত প্রদান করে ধন্য করেন।

বাদশাহও হযরতের প্রতি অশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তি পোষন করতেন। তিনি প্রায়ই দরবারে এসে হযরতের খেদমতে খোঁজ খবর রাখতেন এবং হযরতের যে কোন নির্দেশ নির্দ্বিধায় পালনে প্রস্তুত ছিলেন। সুলতান নিজেই হযরত আলাউল হকের মুরিদ ছিলেন এবং পুত্রগণকে হযরতের গোলামীতে সোপর্দ করেন। সুলতান সর্বোতভাবে মাহবুবে ইয়াযদানীকে সন্তুষ্ট করতে তৎপর ছিলেন।

সুলতান হযরতের কয়েকটি জ্বলন্ত কারামত দেখে আরো অভিভুক্ত হয়ে পড়েন। হযরতের দোয়ায় সুলতান কয়েকটি অভাবনীয় বিজয় অর্জনে সক্ষম হলে তাঁর আস্থা আরো সুদৃঢ় হয়। পরবর্তীতে সুলতানের জীবনে তাই হযরতের অপ্রতিরোধ্য প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, যা ঐতিহাসিকগন উল্লেখ করেছেন। যখন গৌড়ের সুলতান সাইফ উদ্দীন শাহ্ এর হাত হতে সেন বংশীয় জমিদার গনেশ ক্ষমতা কেড়ে নিলেন এবং মুসলমানদের উপর অসহনীয় অত্যাচার চালাতে লাগলেন তখন হযরত নূরে কুতুবে আলম ইব্রাহিম শর্কীকে চিঠি দিয়ে আহবান জানালেন উপযুক্ত প্রতিবিধান করতে। ইব্রাহীম শর্কী সে চিঠি পেয়ে হযরত আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানীর কাছে পরামর্শ চেয়ে চিঠি লিখেন। হযরত উত্তরে লিখেন, "আপনি আপনার অসংখ্য দিগ্বিজয়ী সৈন্যকে বাংলা আক্রমনের জন্য সমবেত করেছেন। এ সম্বন্ধে আমার মত প্রকাশ করা উচিৎ। আমি আপনার সাফল্য কামনা করি। ধার্মিক রাজাদের পক্ষে ইসলাম ধর্ম রক্ষার জন্য সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করার চেয়ে আনন্দের কাজ আর কিছুই নেই।"

এখানে তিনি দুই মাস অবস্থান করেন। এ সময় অসংখ্য লোক তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে ধন্য হয়। বহু হাজতমন্দ হযরতের দোয়ায় মুক্তি লাভ করে এবং এভাবে শহরের আনাচে কানাচে হযরতের দয়ার প্রতিফলন ঘটে।

জৌনপুরে এক বিশেষ ঘটনা

একদিন হযরত মসজিদে সঙ্গী সাথীদের নিয়ে বসা ছিলেন। এক পর্যায়ে তাঁর মধ্যে বিশেষ অবস্থার লক্ষণ ফুটে উঠল। তিনি এক ধরনের বিহ্বলতার মাঝে বিচরণ করতে লাগলেন। (এ ধরনের অবস্থাকে 'অজদ' এবং 'জজবী' হালত বলা হয়) তাঁর পবিত্র জবান হতে হঠাৎ উচ্চারিত হলো- الناس كلهم عبد لعبدى অর্থাৎ সব লোক আমার গোলামের গোলাম। একথা শুনে উপস্থিত ব্যক্তিগন এ কথা বাইরে প্রকাশ না করার ব্যাপারে সর্তকতা অবলম্বন করলেন। কেননা আধ্যাত্ম জগতের রহস্যাদি সম্পর্কে অনবহিত ব্যক্তিগণ এ ধরনের বক্তব্য শুনে হয়তো এ নিয়ে বিবাদ সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু হযরতের একজন ভক্তশিষ্য হাজী ছদরুদ্দিন অসাবধানতা বশতঃ এ কথা সাধারণ মানুষের কাছে প্রকাশ করে ফেলেন। ফলে ওখানকার আলেম সমাজে এ নিয়ে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি হলো। কিছু আলেম হযরতের ব্যাপারে এমনিতেই ঈর্ষান্বিত ছিলেন, এখন এমন মোক্ষম সুযোগ পেয়ে তাঁরা হযরতকে ছেড়ে দিতে যে নারাজ তা স্পষ্ট হলো। তাঁরা হযরতের শানে বাইরে বাইরে বিভিন্ন মন্তব্য করতে লাগলেন যদিও সামনে এসে এ নিয়ে কথা বলার হিম্মত কারো ছিলনা।

বাইরের এ সব আলোচনা সমালোচনা এক সময় দরবারে হযরত কাজী শেহাব উদ্দিনের গোচরীভুত হলে তিনি সমালোচনাকারী মৌলভীদের উদ্দেশ্যে বললেন, আপনারা তো শুধু বাহ্যিক বিষয়ের আলেম, বাতেনী বিষয়ে সম্পূর্ণ অনবহিত ও অনভিজ্ঞ। কোন্ অবস্থায় এ ধরনের বক্তব্য হযরতের জবানে প্রকাশ পেয়েছে তাতো আপনারা অনুধাবন করতে অপারগ।

কিন্তু শেখুল ইসলাম হযরত কাজী শেহাবউদ্দিনের এ ধরনের ব্যাখ্যায় মৌলানাগণ সন্তুষ্ট হলেন না বরঞ্চ কেউ কেউ বলতে লাগলেন যে, আলেমগণের দায়িত্ব হলো সত্য সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা। যদি কেউ অহংকার ও দর্পভরে কোন দাবী উত্থাপন করে তবে সেটার প্রতিবাদ না করলে আলেমগণ থাকার কি প্রয়োজন? তাঁরা নাছোড়বান্দা হয়ে এ বিষয়ে হযরতের কাছে কৈফিয়ত তলব করতে বদ্ধপরিকর হলেন। এমনকি একজন কটুভাষী মাহমুদ বহিয়া নামক ছাত্রকে তাঁরা সাথে নিয়ে এলেন হযরতকে কঠিন প্রশ্নবানে নাজেহাল করার উদ্দেশ্যে।

এসব দেখে হযরত কাজী শেহাব উদ্দীন বললেন, আপনারা যখন ছাড়বেনই না তখন আমার উপর ছেড়ে দিন, আমি আপনাদেরকে আগামীকাল এ বিষয়ে সন্তুষ্ট করব। তিনি হযরত মাহবুবে ইয়াযদানীর খেদমতে গিয়ে উপবেশন করলেন। অবশ্য এসব বিষয়ে হযরতকে কিছু বলা হয়নি। হযরত ওয়াজ নসীহত করছিলেন, তাসাউফ, মারেফাত ইত্যকার বিষয়ে বিরামহীনভাবে। কাজী শেহাব উদ্দিনের আকাংখা হলো আজ মৌলভীদের প্রশ্নের ব্যাপারে হযরতের ব্যাখ্যা জেনে নিতে। কিন্তু হযরতের কাছে বলার সাহস পাচ্ছিলেন না। হযরত ওয়াজ নসিহত শেষ করলেন তবুও কাজী সাহেব কিছু বলতে পারলেন না। বরঞ্চ তিনি হযরত হতে বিদায়ের অনুমতি চাইলেন। তখন হযরত তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, 'বিদায় চাচ্ছেন কেন, আপনার আসল উদ্দেশ্যইতো পুরণ হয়নি।' উপস্থিত অন্যান্যরা হতবাক হয়ে গেলেন কিন্তু কাজী শেহাবউদ্দিন সাহেব ঘেমে নেয়ে উঠলেন এবং ভয়কম্পিত কণ্ঠে আরজ করলেন, হুজুর মৌলভীগণ الناس كلهم عبد لعبدى এ কথা শুনেছে। বাহ্যিকভাবে এ কথা দ্ব্যর্থবোধক হওয়ায় আমি বাধ্য হয়ে এর বিশ্লেষণ জানার জন্য হুজুরের খেদমতে এসেছি সত্য কিন্তু হযরত হতে জিজ্ঞাসা করার সাহস পাচ্ছিনা।"

হযরত মাহবুবে ইয়াযদানী বললেন, কাজী সাহেব! এটাতো অত্যন্ত সহজ বিষয়। 'আন্নাস' শব্দটির যে 'আলিফ-লাম' তা 'আহদি'। সুতরাং 'আন্নাস' শব্দের অর্থ হবে অনেক লোক। অতএব অনেক লোক আমার গোলামের গোলাম হবে। এর ব্যাখ্যা আরো সহজতর করে হযরত বললেন, অধিকাংশ লোক হচ্ছে নফস বা প্রবৃত্তির গোলাম। 'নফসের' কামনা বাসনা ও লালসায় তারা পরিচালিত হয়। কিন্তু খোদা তায়ালা নফসকে আমার নিয়ন্ত্রণে করে দিয়েছেন। আমি যা বলি 'নফস' তাই প্রতিপালন করে। আমি নফসের নই বরং নফস আমার আনুগত্য করে। সুতরাং যে সব লোক নফসের গোলাম তারা আমার গোলামের গোলাম।এ ব্যাখ্যা শুনে কাজী সাহেব সন্তুষ্ট চিত্তে বিদায় নিলেন।

শেষ সফর

হিজরী ৮০৮ সনের মহরম মাস। বৎসর ও মাসের নতুন চাঁদ দেখে হযরত অশেষ খুশী প্রদর্শন করলেন এবং এরশাদ ফরমালেন, যদি দাদাজান হযরত ইমাম হোসাইন (রঃ) এর অনুসরণের সৌভাগ্য হতো! এর পর থেকে হযরতের অবস্থা খারাপ হতে শুরু করে। ফলে তিনি দেখা সাক্ষাৎ ও কথাবার্তা প্রায় বন্ধ করে দেন। এ সংবাদে দলে দলে লোক হযরতের অবস্থা জানতে আসতে লাগল। হযরত কিন্তু কথাবার্তা ও

দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ করলেও নির্জনে এবাদত বন্দেগী করে যেতে লাগলেন। কাউকে শরীরের অবস্থার কথা জানতে দিলেন না।

একদিন হযরত সিমনানী (রাঃ) নুরুল আইন, দুররে ইয়াতিম প্রমুখ ঘনিষ্ট ব্যক্তিদের ডেকে বললেন, "আমি জীবিত অবস্থাতেই স্বীয় কবর তৈরী করাতে চাই।" ফলে কবর তৈরী হলো। এদিকে লোকজন ভেবে কুল পাচ্ছিলনা যে, হযরতের অবস্থাতো এতদুর অবনতি ঘটেনি যাতে আর সুস্থ হবেন না বলে আশংকা জাগে। কারো মনেই হযরতের বিদায় নেবার কথা জাগেনি। এ দিকে পীরজাদা হযরত নূরে কুতুবে আলম পাণ্ডবী (রঃ), শেখুল ইসলাম রুমী (রঃ) ভ্রমনোপলক্ষে এখানে উপস্থিত হয়েছেন। হারাম শরীফে অবস্থানকারী হযরত নাজমুদ্দিনও হঠাৎ এসে উপস্থিত হলেন। হযরত নূরে কুতুবে আলম একদিন হযরতকে লক্ষ্য করে বললেন, "আল্লাহ আপনাকে সুস্থতা দান করুন। কেননা আপনি আমার পিতারই স্মৃতিস্বরূপ।" হযরত বললেন, "সুস্থতা এবং দীর্ঘ জীবন আল্লাহ্ আপনাকেই দান করুন! আমার এবং স্রষ্টার মাঝে এখন ছোট একটি পর্দা মাত্র বিদ্যমান। সেটা উঠে যাওয়াই সমীচীন যাতে বন্ধু বন্ধুর সাথে মিলিত হতে পারে।"

হযরতের একথা শুনে সকলে যা বুঝার বুঝে নিলেন। উপস্থিত সকলে শোকের সাগরে নিমজ্জিত হলেন। সকলের আঁখি হতে আঁসু ঝরতে লাগল। হযরত নুরুল আইনতো কাঁদতে কাঁদতে চরম অস্থির হয়ে পড়লেন। মহরমের পনের তারিখ 'আবরার'গণ হযরতকে দেখতে এলেন। ষোল তারিখ এলেন "আবদাল'গণ। একদিন পর 'আওতাদ'গণও এলেন। এভাবে কাটাতে লাগল। কিন্তু ১৮, ১৯, ও ২০ তারিখ হযরত বেঁহুশ অবস্থায় রইলেন। শুধুমাত্র নামাজের অক্ত সমূহে হুঁশ হতেন এবং ফরজ আদায় করতেন। ২১ তারিখ কিছুটা উন্নতি পরিলক্ষিত হলো। ২২ তারিখ হতে লোকের অস্বাভাবিক ভিড় বাড়তে শুরু করল। মশায়েখ, আলেম ফাজেল এবং অসংখ্য মুরিদ হযরতকে দেখতে ভিড় জমাতে লাগলেন। এভাবে ২৭ তারিখের ফজর এগিয়ে আসল। ভোরে ফজরের নামাজে হযরত একজন অচেনা লোককে নামাজের ইমামতি করার নির্দেশ দিলেন। হযরত নুরুল আইন এটা দেখে কাঁদতে লাগলেন। কেননা অন্যজনকে ইমামতি করতে বলার মধ্যে স্বীয় দায়িত্ব অন্যকে সোপর্দ করার ঈঙ্গিত বিদ্যমান।

হযরত গাউসুল আলম অজিফা এবং নামাজে এশরাক আদায়ের পর খাস কামরায় ঢুকে বিশেষ কয়েক জনকে ডেকে পাঠালেন। তন্মধ্যে হযরতের খাস খলীফাগণও

ছিলেন। হযরত তাঁদেরকে নিজ ওফাতের ঈঙ্গিত করে বললেন যে, কেউ যেন তাঁর ইন্তেকালের পর পেরেশান না হয় এবং চোখের পানি না ফেলে। অতঃপর হযরত নূরুল আইনকে স্বীয় উত্তরাধিকারী ও স্থলাভিষিক্ত ঘোষণা করে তাঁকেও অনেক খাস পরামর্শ প্রদান করেন। ২৮ তারিখ সকালে হযরত কামরায় শুয়ে ছিলেন, অন্যান্যরাও উপস্থিত। হযরত বিবিধ বরকতময় স্মৃতিস্মারকসমূহ যা তিনি ভ্রমনকালে বুযর্গানে কেরামের নিকট হতে পেয়েছিলেন বন্টন করে দিলেন। জোহরের অক্ত হলে সুন্নাত আদায় করে ফরজ নামাজের ইমামতি করার জন্য হযরত নূরুল আইনকে নির্দেশ দিলেন। অতঃপর নামাজ আদায় শেষে হুজরায় এসে বসলেন, তারপর ছামা মাহফিলের আয়োজন করতে নির্দেশ দিলেন। কাওয়ালের সুললিত কণ্ঠে আবৃত্ত হলো শেখ সাদী (রঃ) এর রচিত শ্লোকঃ-

گر بدست تو آمده اجلم ❖ قد رضینا بما جری القلم

(অর্থাৎ যদি তোমারই হাতে আমার অন্তিম সময় আসার হয় তাহলে আমরা তকদীরের লিপির উপর সন্তুষ্টচিত্তে আত্মসমর্পনকারী)

এ শ্লোক শুনে হযরতের মধ্যে প্রবল ভাবাবেগ সৃষ্টি হলো। এরপর যখন কাওয়ালগণ পুনরায় পড়লেনঃ

خوب تر زین دیگر چه باشد کار ❖ یار خندان رود بجانب یار
سیر بیند جمال جانان را ❖ جان سپارد نگار خندان را

(অর্থাৎঃ এর চাইতে শ্রেয় কাজ আর কি হতে পারে যে, একজন আশেক স্বীয় মাহবুবের সমীপে হাঁসতে হাঁসতে যাবে, শৃংখলা বিহীনভাবে মাহবুবের সৌন্দর্য আলোকন করবে আর হাঁসি প্রদান কারীর প্রতি স্বীয় জীবন সোপর্দ করে দেবে।)

উক্ত শ্লোক শুনে তিনি প্রচন্ড আবেগে কেঁপে উঠলেন এবং এ অবস্থায় তাঁর রুহ মোবারক মহান স্রষ্টার সান্নিধ্যে মিলিত হয়ে গেল। ((ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন))

মাহবুবে ইয়াযদানী (রঃ) এর উত্তরাধিকারী এবং তরিকার বর্তমান অবস্থা

হযরত মাহবুবে ইয়াযদানী শেখ সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী (রঃ) এর পর তাঁর উত্তরাধিকারের ধ্বজা হযরত আবদুর রাজ্জাক নূরুন আইন (রঃ) এর উপর বর্তায়। কেননা হযরত মাহবুবে ইয়াযদানী চিরকুমার ছিলেন বিধায় সন্তান সন্ততির প্রশ্ন অবান্তর। তাই তাঁর রূহানী সন্তান হযরত আবদুর রাজ্জাক (রঃ)-ই তাঁর ওফাতের পর তরিকতের দায়িত্বে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন এবং আবদুর রাজ্জাক নূরুল আইন (রঃ) এর বংশধরগণ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী (রঃ) এর দিকে নিজেদের পরিচয়কে বিশেষিত করেন। ফলে তাঁরা 'আশরাফী খান্দান' হিসাবে পরিচিত হন।

হযরত 'নূরুল আইন' (রঃ) হযরত গাউসুল আজম দস্তগীর মাহবুবে সুবহানী পীরানে পীর, মুহিউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানী (রঃ) এর বংশধর ছিলেন।[১] তিনি গিলানেই স্বীয় পিতা-মাতার সাথে বসবাস করতেন, তাঁর মাতা হযরত মাহবুবে ইয়াযদানীর (র) খালাতো বোন। হযরত যখন গিলানে গিয়েছিলেন তখন কিশোর আবদুর রাজ্জাক তাঁর প্রতি অতিশয় আকৃষ্ট হন এবং চিরদিনের জন্য মাতা-পিতার অনুমতি নিয়ে হযরতের সঙ্গ অবলম্বন করেন। হযরতও তাঁকে স্বীয় রুহানী সন্তানরূপে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে ইতোপূর্বেও উল্লেখিত হয়েছে।

গাউসুল আলম হযরত মাহবুবে ইয়াযদানীর ইন্তেকালের পর প্রায় চল্লিশ বছর হযরত 'নূরুল আইন' স্বীয় স্কন্ধে অর্পিত দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর পর তাঁরই সুযোগ্য পুত্রগণের উপর এ দায়িত্ব অর্পিত হয়।

হযরত নূরুল আইনের (রঃ) পাঁচ পুত্র সন্তান ছিলেন। পাঁচজনই অতি বুযর্গ ও নেক্কার ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁরা হলেন হযরত শামসুদ্দিন, হযরত সৈয়দ হাসান, সৈয়দ হোসাইন, সৈয়দ আহমদ এবং সৈয়দ শাহ ফরিদ (রঃ)। হযরত মাহবুবে ইয়াযদানী (রঃ)

(১) হযরত গাউসুল আজম সৈয়দ মুহিউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানী (রঃ) এর সন্তান হযরত সৈয়দ তাজুদ্দিন আবু বকর আবদুর রাজ্জাক (রঃ) এর বংশে হযরত নূরুল আইন গাউসে আজমের দশম অধস্তন পূরুষ।

ইন্তেকালের সময় এ পাঁচজনকেই অশেষ স্নেহভরা দোয়া ও অমূল্য তাবাররুক দান করেছিলেন। তন্মধ্যে হযরত সৈয়দ শামসুদ্দিন (রঃ) আঠার বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন এবং অপর চার জন আশরাফিয়া বংশীয় ও তরিকতের ধারাকে সম্প্রসারিত করেন এবং জীবিত রাখেন। এদের চার জনের মধ্যে হযরত সৈয়দ ফরিদ (রঃ) এর বংশীয় ধারা তাঁর পরে কয়েক পুরুষ পর বিলুপ্ত হয়ে যায়।

বর্তমানে হযরত সৈয়দ শাহ হাসান (রঃ) ও হযরত সৈয়দ শাহ হোসাইন (রঃ) এর বংশধরগণ বাসখারী ও কাছওয়াচা সহ রুহআবাদ রাসুলপুরে এবং হযরত শাহ আহমদ (রঃ) এর বংশধরগণ জায়েস শরীফে (রায় বেরেলী) বিদ্যমান রয়েছেন। নবী দুলারী খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতেমা (রঃ) এর নয়নের দুই মনি হযরত হাসান (রাঃ) ও হোসাইন (রাঃ) এর বংশীয় ধারার মিলন মোহনা হযরত গাউছুল আজম পীরানে পীর (রঃ) এর শোনিতের গৌরবজনক উত্তরাধিকার এবং শহীদে কারবালা হযরত ইমাম হোসাইন (রঃ) এর বংশীয় ধারার হযরত মাহবুবে ইয়াযদানী (রঃ) এর রূহানী ও জিসমানী একাত্মতার ফলে আশরাফিয়া খান্দান এক বিরল সম্ভ্রান্ততা ও আভিজাত্যের অধিকারী। ফলে সৈয়দ বংশীয় এ ধারাটি এমন বিরল স্বাতন্ত্র ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে বংশগত ভাবে যেমন শরীফ হিসাবে খ্যাতিমান তেমনি তাঁদের দ্বীনি খেদমত, উন্নত চারিত্রিক মাধুর্য ও ইলমে দ্বীনের পাণ্ডিত্যের জন্যও তাঁরা এশিয়া ইউরোপসহ পৃথিবীর সর্বস্থানে সুপরিচিত।

গাউছুল আজম হযরত শাহ্ সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (রঃ) এর পূর্ব পুরুষগণের ইলমী ও আমলী উঁচু রোতবা সম্পর্কে সকলে কিছু না কিছু অবহিত, যা দ্বারা গাউসে পাকের বংশীয় পরম্পরার মর্যাদা সকলের নিকট সুপ্রতিষ্ঠিত। এমনিভাবে গাউছুল আলম হযরত মাহবুবে ইয়াযদানী (রঃ) এর বংশীয় পূর্ব পুরুষগণের অনন্য মর্যাদাও সবিশেষ উল্লেখ যোগ্য। জানা যায় যে, তাঁর পূর্ব পূরুষগণ পুরুষানুক্রমে একাধারে সুলতান, দরবেশ, হাফেজ, আলেম এবং কারী হিসাবে অতিক্রান্ত হয়েছেন। তাই 'খানদানে আশরাফিয়ার' উত্তরপুরুষগণের মধ্যে স্বভাবে, গুনে, জ্ঞানে-কর্মে উল্লেখিত দুই মহাপূরুষের পূরুষানুক্রমিক গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের বিশেষ ছাপ ও প্রভাব সুস্পষ্ট। তাই হযরত আবদুর রাজ্জাক নুরুল আইন (রঃ) এর উত্তরপুরুষগণ শরীয়ত এবং তরিকত উভয় ক্ষেত্রেই খেদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন। যে স্থানত্রয়ে আলোকিত করে হযরত নূরুল আইন এর তিন উত্তর পুরুষের স্থায়ী আবাসস্থল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা হেদায়তের প্রজ্জলিত আস্তানা হিসাবে আজ পাপী তাপীর শোধনাগার রূপে দাঁড়িয়ে

আছে। চক্ষুষ্মান আলেমগণের অভিমতানুযায়ী কিয়ামত পর্যন্ত ইনশাল্লাহ এগুলো প্রতিষ্ঠিত থাকবে।[১]

তাই বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত হতে ছুটে আসে অসংখ্য আল্লাহর বান্দা। এখানে এসে অশান্ত বিক্ষুব্ধ আত্মায় অর্জিত হয় শান্তি। গভীর আত্মবিশ্বাসে ভরে যায় অন্তর যে, রাসুলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আহলে বায়তের এ ধারাটির কাছে এসে কৃত তাওবা খোদা তায়ালা মাফ করেছেন এবং এভাবে তাদের আগামীর দিনগুলি হয় খোদা ও রাসুলের সন্তুষ্টির পথে উৎসর্গিত।

হযরতের শীর্ষস্থানীয় খলিফাগন

দ্বীনের প্রচার ও শিক্ষা উপলক্ষে হযরত মাহবুবে ইয়াযদানী (রঃ) জগতের বহু স্থানেই সফর করেছেন। হেদায়তের মশাল জ্বালিয়ে পৌত্তলিক, অগ্নি উপাসক ও ইহুদী খ্রীষ্টানদের ইসলামের সুশীতল ছায়ায় টেনে এনেছেন এবং আল্লাহর পথে সফরকারীদের দীক্ষাদানে কৃতার্থ করেছেন। যেখানেই তিনি অবস্থান করেছেন অসংখ্য-অগুনিত বান্দা তাঁর হাতে হাত রেখে পাপরাজি হতে তাওবা করেছে এবং খোদার সন্তুষ্টি অর্জনে সংকল্পবদ্ধ হয়েছে। এসব বান্দার শিক্ষা-দীক্ষা ও তরবিয়তের জন্য তিনি তাঁদের মধ্য হতে একজনকে মনোনীত করে দায়িত্বভার দিয়ে অন্য স্থানে গমন করতেন। পরিভাষায় এদেরকে 'খলীফা' বা খেলাফত প্রাপ্ত বলা হয়। অসংখ্য সৌভাগ্যবানকে তিনি খেলাফত প্রদানে ধন্য করেছেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ও শীর্ষ স্থানীয় কয়েকজনের নাম নিম্নে বর্ণিত হচ্ছে।

হযরত শাহ্ সৈয়দ আবদুর রাজ্জাক 'নূরুল আইন' (রঃ)ঃ ইনি হযরতের রুহানী সন্তান। খাস শিষ্য এবং হযরত মাহবুবে ইয়াযদানী (রঃ) এর পর সাজ্জাদানশীন হিসাবে আশরাফিয়া তরিকা ও খান্দানের বিস্তৃতির ভার তাঁর উপরই ন্যস্ত হয়।

হযরত শেখ নেজাম গরীব ইয়ামেনী (রঃ)ঃ- তিনি হযরতের অন্যতম প্রধান শিষ্য। ৭৫০ হিঃ সনে তিনি হযরতের শিষ্যত্ব অবলম্বন করেন এবং প্রায় আটান্ন বৎসর যাবৎ হযরতের ওফাত পর্যন্ত সঙ্গে থাকেন। তিনি মাহবুবে ইয়াযদানী (রঃ) এর বক্তব্য, কথাবার্তা, চিঠিপত্র ও জীবনের বহু খুঁটিনাটি বিষয়ের উপর 'লতাঁয়েফে আশরাফী' নামক গ্রন্থরূপ (মালফুজাত) সংকলন করেন।

(১) হযরত রাসুলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "আমার আহলে বায়তগন আমার উম্মতের জন্য হযরত নুহ (আঃ) এর কিশতির (নৌকা) ন্যায়। যারা তাতে আরোহন করবে, তারা মুক্তি লাভ করতে পারবে"।

হযরত মাওলানা শেখ কবির (রঃ)ঃ- হযরত গাউসুল আজমের প্রিয়তর খলীফাদের অন্যতম। তাঁর সম্পর্কে হযরত স্বয়ং বলেছেন যে, শেখ কবির একজন উঁচু মর্তবার অলী। তাঁর সম্পর্কে গ্রন্থে উল্লেখ আছে।

হযরত মুহাম্মদ দুররে ইয়াতীম (রঃ)ঃ- শেখ কবিরের সন্তান। দুররে ইয়াতীম সম্পর্কেও গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে। তাঁর লালন পালন, শিক্ষা দীক্ষা সবই মাহবুবে ইয়াযদানী (রঃ) এর তত্ত্বাবধানে হয়েছে। 'দুররে ইয়াতীম' হযরত মাহবুবে ইয়াযদানী কর্তৃক স্নেহের সম্বোধন ছিল, সে নামেই তিনি পরিচিতি লাভ করেন।

হযরত মাওলানা শেখ শামসুদ্দিন ফরিয়াদরস (রঃ)ঃ- ইনিও হযরতের একজন অন্যতম খলিফা ছিলেন। হযরত একদা রুহ আবাদ শরীফ হতে অযোধ্যা তশরীফ নিয়ে গেলে সেখানকার প্রখ্যাত আলেম শেখ শামসুদিন হযরতের কাছে দীক্ষা নেন। তাঁকে হযরত খুব ভালবাসতেন এবং তাঁর মর্যাদা ও ইলম সম্পর্কে ভূয়সী প্রশংসা করতেন। তাঁর কথাও কিতাবে উল্লেখিত হয়েছে।

হযরত মাওলানা রফিউদ্দিন 'উদ্হী' (রঃ)ঃ- ইনিও হযরতের একজন বিশিষ্ট খলীফা। ইনি হযরত শামসুদ্দিন ফরিয়াদরস (রঃ) এর উস্তাদ।

হযরত সৈয়দ ওসমান (রঃ)ঃ- ইনি সৈয়দ মোহাম্মদ গিছুদরাজ (রঃ) এর বংশের লোক। হযরত গাউছুল আলম (রঃ) হতে দীক্ষা নেন এবং পরে খেলাফত লাভ করেন।

হযরত শেখ সোলায়মান মুহাদ্দিস (রঃ)ঃ- হযরতের বিশিষ্ট খলীফা, কামেল আরেফ, বিজ্ঞ আলেম এবং প্রসিদ্ধ 'মুহাদ্দিস' ছিলেন। তিনি সুরাটে বসবাস করতেন।

হযরত শেখ মারুফ (রঃ)ঃ- তাঁর উল্লেখও কিতাবে এসেছে। অধিকাংশ সময় হযরতের সফরে সাথী হতেন। জৌনপুরে অবস্থানকালে তিনি খেলাফত লাভ করেছিলেন।

হযরত কাজী হুজ্জাত (রঃ)ঃ- একজন বিখ্যাত আলেম ও দার্শনিক ছিলেন। হযরতের সাথে মুলাকাত হবার পর তিনি হযরতের প্রতি এত বেশী আকৃষ্ট হন যে, হযরতের কাছেই তিনি স্থায়ীভাবে থেকে যান।

হযরত শেখ আরেফ (রঃ)ঃ- হযরতের খলীফা এবং কারামতসমৃদ্ধ প্রসিদ্ধ বুযর্গ।

হযরত শেখ আবুল অফা খোরাজমী (রঃ)ঃ- 'কালাম ও আকাইদ' শাস্ত্রে অত্যন্ত পারদর্শী আলেম ছিলেন। ইলমে তাসাউফেও সমান দক্ষতা ছিল। বিশিষ্ট খলীফা ও হযরতের একনিষ্ঠ মুরিদদের অন্যতম।

হযরত শেখ আবুল মকারিম (রঃ)ঃ- আমীর তৈমুর (তৈমুর লং) এর সেনাপতি এবং হিরাতের শাসনকর্তা ছিলেন। তাঁর নাম ছিল আমীর আলী বেগ। হযরত গাউসুল আলম তুর্কীস্থান সফরকালে হযরতের সাথে সাক্ষাত করতে এসে তিনি এমনভাবে মোহিত ও আকৃষ্ট হয়ে যান যে, সব কিছু পরিত্যাগ করে থেকে যান এবং একাধারে বার বছর হযরতের খেদমতে অতিবাহিত করেন। শরীয়ত ও দ্বীনি ব্যাপারে তাঁর বিন্দুমাত্র লিখাপড়াও ছিলনা। তথাপি মুর্শিদের অমূল্য সাহচর্য ও কৃপা দৃষ্টির বদৌলতে ইলমে লাদুন্নি অর্জিত হয়। হযরত তাঁকে খেলাফত দান করে খোরাসানের বেলায়ত অর্পন করেন এবং সেখানে পাঠিয়ে দেন। 'আবুল মকারিম' খেতাবও হযরত প্রদত্ত।

হযরত শেখ ছফিউদ্দিন (রঃ)ঃ প্রখ্যাত আলেম ও বিজ্ঞ ফকিহ্ ও উঁচু মর্যাদার বুযর্গ ছিলেন। হযরত যখন 'রাদুলি' এসেছিলেন তখন তিনি হযরতের মুরিদ হন এবং পরে খেলাফত লাভে সৌভাগ্যবান হন।

হযরত শেখ খায়রুদ্দীন সিধুরী (রঃ)ঃ হযরতের শীর্ষস্থানীয় খলীফাদের অন্যতম। হযরত গাউসুল আলম যখন অযোধ্যা এসে অবস্থান করেন তখন তিনি হযরতের মুরিদ হয়েছিলেন এবং হযরত তাঁকে খেলাফত দান করেন। বড় বুযর্গ ছিলেন।

হযরত কাজী মোহাম্মদ সিধুরী (রঃ)ঃ সিধুরের কাজী এবং প্রসিদ্ধ আলেম ছিলেন। হযরত সিধুরে আগমন করলে তিনি মুরিদ হন এবং হযরতের সাথে জায়েস (রায় বেরেলী) আসেন। পরে হযরত তাঁকে খেলাফত দানে ধন্য করেন।

হযরত আবু মোহাম্মদ সিধুরী (রঃ)ঃ ইনিও সিধুরের বাসিন্দা এবং খেলাফত প্রাপ্ত।

হযরত মাওলানা শেখুল ইসলাম গুজরাতী (রঃ)ঃ আহমেদাবাদের অধিবাসী, শীর্ষস্থানীয় আলেম ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে কিতাবে যথাস্থানে বিধৃত হয়েছে।

এমনি ভাবে **হযরত ছেমাউদ্দীন (রঃ)** (রাদুলী)- **হযরত মাওলানা আবুল মোজাফ্ফর লাখনভী (রঃ)** (লখ্নৌ) **হযরত মাওলানা এলামউদ্দীন জায়েসী (রঃ)** (জায়েস) এবং **হযরত সৈয়দ আবদুল ওহাব** (রঃ) প্রমুখের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

হযরতের বিশেষ মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য

গাউসুল আলম হযরত মাহবুবে ইয়াযদানী (রঃ) এর মর্যাদা ও ফজিলত বর্ণনা করে প্রকাশ করাও সম্ভব নয় এবং সে সম্পর্কে অনুমান করাও সহজ নয়। কেননা এমন অশেষ নেয়ামতে এলাহী লাভে ধন্য হয়েছেন যে, সেগুলো সম্পর্কে খুব অল্প লোকই অবগত। তবে এতটুকু নিশ্চয় সকলের বোধগম্য হবে যে, সর্ব প্রথম ফজিলত হলো নবী করীম হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বংশে জন্ম গ্রহণ। এটাই খোদার অপরিসীম অনুগ্রহের নিদর্শন। বাহ্যিকভাবে বাদশাহী মুকুট ও সিংহাসন লাভ, আধ্যাত্ম জগতে কুতুবুল আকতাব, গাউসুল ওয়াক্ত (সে সময়কার গাউস) এর মর্যাদা দিয়ে জমীনের বিরাজমান অলিগণের মধ্যে শীর্ষপদে অধিষ্ঠান, ইলম ও কর্মকান্ডে 'মুজাদ্দিদ' বা সংস্কারক হিসাবে বাছাই, 'মাহবুব' ও জাহাঙ্গীর উপাধি অর্জন-এ সবই তো তাঁর অপরিসীম মর্যাদা ও খোদায়ী নৈকট্য লাভের দলিল। তাঁর এ মহান মর্যাদার পাশাপাশি যে বিষয়টি সমান বিবেচ্য তা হলো সৃষ্টির কল্যানেই তিনি তাঁর সমস্ত যোগ্যতা ও মনোযোগ নিবিষ্ট করা। কেননা বেলায়তের যে মর্যাদা ও স্তর সমূহ বিদ্যমান সেখানে সৃষ্টির কল্যাণ সাধনে দায়িত্বরতই শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার।

হযরত মাহবুবে ইয়াযদানী বলেছেন যে, গাউসিয়তের মর্যাদা লাভের পূর্ব পর্যন্ত তিনি ছিলেন গাউসের বাম পার্শ্বস্থ আসনে সমাসীন আবদুল মালিক মর্যাদায়। আর ডান পার্শ্বস্থ আসনে সমাসীন হন 'আবদুর রব'। এ বিষয়ে একদা হযরত শেখ মোবারক জিজ্ঞাসা করলেন এ রহস্যের সমাধান চেয়ে যে, সাধারন বুদ্ধি ও বিবেচনায় বলে, ডান পার্শ্বস্থ ব্যক্তি বাম পার্শ্বস্থ ব্যক্তি হতে উত্তম হবেন তাই ডান পার্শ্বস্থ ব্যক্তিই গাউস হবার কথা। অথচ বাম পার্শ্বস্থ অবস্থানধারী আবদুল মালিক হিসাবে গাউসিয়তের জন্য আবদুর রবের উপর অগ্রাধিকার কিভাবে অর্জিত হয়? তখন হযরত এ সম্পর্কে বলেন, বাম পার্শ্বস্থ অবস্থানধারী দেহ জগতের ইমাম এবং পৃথিবীর সকল প্রাণীর ব্যাপারেই তিনি খোদার পক্ষ হতে প্রাপ্ত বিশেষ তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালন করেন। আর 'আবদুর রব' তত্ত্বাবধান করেন রুহ জগতের। তাই দেহ জগতের তত্ত্বাধায়ক রূহ

জগতের তত্ত্বাবধায়ক হতে শ্রেষ্ঠ। এজন্য বামে অবস্থানকারী অগ্রাধিকার লাভ করে থাকেন।

এ থেকে বুঝা যায় যে, সৃষ্টি জগতের কল্যাণে নিয়োজিত থাকাটা আল্লাহর অলিগণের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্যও বটে। কোরান করীমেও এ দিকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আল্লাহ বলেন,

(অর্থাৎ তারা আল্লাহর ইচ্ছার বাস্তবায়নে নিয়োজিত) *(সুরা নাজেয়াত আঃ ৫ সুরা ৭৯; ৩০ আমপারা)* এ আয়াত হতে হযরত শাহ্ আবদুল আজিজ দেহলভী (রঃ) আউলিয়া কেরামের এ বৈশিষ্ট্য সপ্রমান করেছেন। বস্তুতই আউলিয়া কেরাম মহামহিম আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি আল্লাহর অপরিসীম করুণা ও দয়ারই প্রতীক এবং সে কারনে তাঁদের সব ধরনের কর্মেই সৃষ্টির কল্যাণ ও উপকার নিহিত থাকে।

হযরত মাহবুবে ইয়াযদানী (রঃ) এর বেলায়ত তাই সর্ব সাধারণের জন্য হয়েছে পার্থিব ও আধ্যাত্মিক উভয় জগতে কল্যাণ ও উন্নতি হাসিলের অনুপম এক অসিলা। অন্যদিকে যদিও তিনি সুফী ও দরবেশরূপে প্রধানতঃ পরিচিতি লাভ করেছেন কিন্তু শরীয়তের ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক জ্ঞানে তাঁর সুপরিসর দক্ষতা, জ্ঞানের বিবিধ শাখায় তাঁর অবাধ পদচারণা ও ব্যুৎপত্তি, বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন ভাষায় তাঁর অসংখ্য রচনাবলী দ্বারাও বিশ্ব মুসলিম হয়েছে সমান লাভবান। তাই তরিকতের পথে মানুষকে দীক্ষা দানের পাশাপাশি মুরিদগণকে হযরত মাহবুবে ইয়াযদানী শরীয়তের জ্ঞান অর্জনের দিকে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। এলম অর্জনকে তিনি এক অপরিহার্য বিষয় হিসাবে সাব্যস্ত করেন। তিনি বলেন, "ইলম হচ্ছে প্রোজ্বল রবি সদৃশ এবং অন্যান্য বিষয়াদি হচ্ছে তারই আলোককণার ন্যায়।"

হযরত মাহবুবে ইয়াযদানী স্বয়ং ছিলেন সাত কেরাতে পারদর্শী কারী ও হাফেজ; আরবী ও ফার্সী কবিতা ও সাহিত্যে ব্যতিক্রমী প্রতিভাধর এবং ইলমে তাফসীর, হাদিস, ফেকাহ্, উসুল, দর্শন, বলাগত, ইলমে কালাম ইত্যাদি সব বিষয়েই তিনি সমান দক্ষ ও ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন ছিলেন।

বাল্যকাল হতেই তাঁর বিস্ময়কর প্রতিভার স্ফুরণ লক্ষ্য করা যায়। মাত্র সাত বৎসর বয়সে তিনি এলমী সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ে এমন পাণ্ডিত্য দেখান যাতে বড় বড় আলেম গণ বিস্মিত না হয়ে পারতেন না। বার বৎসর বয়সে তিনি মাদ্রাসা শিক্ষার সবগুলো বিষয়ে চূড়ান্ত সনদ হাসিলে সক্ষম হন।

তিনি ইলমে হাদিসের তৎকালীন বিখ্যাত ইমাম হযরত আবদুল্লাহ্ ইয়াফেয়ী হতে মক্কায় গিয়ে হাদিস শাস্ত্রে সনদ লাভ করেন। আরো কয়েকজন বিশ্ববিশ্রুত ইমামও হযরতকে হাদিসের সনদ প্রদান করেন। অন্যান্য বিষয়েও তিনি জগদ্বিখ্যাত ইমামগণ হতে শিক্ষা লাভ করেন। শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি পাঁচ বৎসর যাবৎ শিক্ষা দানের কাজেও নিয়োজিত ছিলেন। এভাবে জীবনের অল্প সময়ের মধ্যে সিমনানের বাদশাহ্জাদা একজন অসামান্য বিজ্ঞ আলেম রূপে প্রতিভাত হন।

হযরতের বিশিষ্ট খলীফা ও 'লতায়েফে আশরাফী' এর সংকলক হযরত নেজামুদ্দিন ইয়ামেনী (রঃ) বলেন, "হযরত মাহবুবে ইয়াযদানীর জ্ঞান ছিল খোদা তায়ালার আশ্চর্য দান। তিনি যেখানেই গমন করতেন সেখানকার স্থানীয় ভাষায় তাদের জন্য পুস্তক প্রণয়ন করে দিতেন। এভাবে আরবী ফার্সী, সুরী তুর্কিসহ বিভিন্ন ভাষায় তাঁর অসংখ্য পুস্তিকা রচিত হয়েছিল।

তিনি যখন কোথাও সফরে যেতেন সেখানকার লোকজন তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, এবং ইলমে জাহের ও বাতেন-এ তাঁর প্রজ্ঞার পরিচয় পেয়ে মোহিত হতো। তারা দলে দলে হযরতের হেদায়তের দিকে ধাবিত হতো। তিনি তাদের অবস্থা ও পারিপার্শ্বিকতার দিকে লক্ষ্য রেখে তাদের নিজ ভাষায় সহজ সরল ভঙ্গিতে ইসলাম ও হেদায়তের মর্মবানী তুলে ধরতেন ওয়াজ-নসীহত ও পুস্তিকার মাধ্যমে। ফলে সেখানে সৃষ্টি হতো এক বিপ্লব। অমুসলিম ও মুশরিক হতো মুসলমান, ফাসেক-ফাজের করতো তওবা, 'রাহে সুলুক' অবলম্বনকারী পেতো গন্তব্যের সহজ সঠিক নির্দেশনা। তিনি আলেমদের জন্যও প্রণয়ন করেছেন বহুগ্রন্থ। জটিল ও দুর্বোধ্য মসায়েলের ব্যাখ্যা, পূর্ববর্তী ইমামগণের রচিত কিতাব সমূহের উপর টীকা টিপ্পনী এবং ভাষ্যগ্রন্থ রচনা করে ইসলামী জগতের জন্য প্রভূত উপকার করে গেছেন।

তিনি ইমাম হযরত শেখ শেহাবউদ্দীন সোহরাওয়ার্দী (রঃ) এর কিতাব 'আওয়ারেফুল মায়ারেফ' হযরত ইমাম শেখ মুহিউদ্দীন ইবনুল আরবী (রঃ) এর 'ফুছুছুল হিকম' এর চমৎকার 'শরাহ' (ব্যাখ্যা গ্রন্থ) রচনা করেন যা মুসলিম পণ্ডিতদের এক দুর্লভ সম্পদ। তাঁর রচিত প্রতিটি গ্রন্থই অতি উন্নত মানের এবং আলেমাগণের প্রশংসিত। বিশেষতঃ 'কাওয়ায়েদুল আকায়েদ' 'আশরাফুল আনছাব' 'বাহরুল আজকার' 'আশরাফুল ফাওয়ায়েদ', 'ফাওয়ায়েদুল আশরাফ' 'বেশারতুয যাকেরীন', 'তানবীহুল ইখওয়ান' 'বেশারতুল ইখওয়ান', 'মুসতালিহাতে তাছাওফ' 'মনাকেবে খুলাফায়ে রাশেদীন', 'হুজ্জাতুজ যাকেরীন', (বাংলায় প্রণীত) 'ফতোয়ায়ে আশরাফিয়া',

'তাফসীরে রাবহে সামানী' 'তাফসীরে নুর বখশিয়াহ', 'আরশাদুল ইখওয়ান' 'রেসালায়ে তাজভীজিয়াহ' 'বাহরুল হকায়েক' এবং 'দিওয়ানে আশরাফ' প্রভৃতি নাম উল্লেখযোগ্য।

তাঁর অসামান্য অবদান ও কর্মকান্ডের স্বীকৃতি ছাড়াও ওলামাগণের মধ্যে অনেকে তাঁকে হিজরী সপ্তম শতাব্দীর আর কেউ কেউ অষ্টম শতাব্দীর মুজদ্দিদরূপে চিহ্নিত করেছেন। 'ওলামায়ে সালাফ' (প্রাচীন আলেম) গণ মুজাদ্দিদের যে তালিকা প্রণয়নের প্রয়াস পেয়েছেন, তাতে প্রথম শতাব্দীতে হযরত ওমর বিন আবদুল আজিজ, দ্বিতীয় শতাব্দীতে ইমাম শাফেয়ী, তৃতীয় শতাব্দীতে হযরত মাওলানা আবুল আব্বাস আহমদ বিন শরীহ, চতুর্থ শতাব্দীতে হযরত আবু বকর বিন তবীব বাকলায়ী, ৫ম শতাব্দীতে হযরত ইমাম গাজ্জালী, ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে হযরত ইমাম ফখরুদ্দীন মুহাম্মদ বিন উমর রাজী এবং ৭ম শতাব্দীতে হযরত আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানীর নাম উল্লেখিত হয়েছে। কোন কোন আলেমের অভিমত মতে, তিনি হিজরী অষ্টম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ। তাঁর জন্ম ও কর্মকালের উপর বিশ্লেষণ করে শেষ মতই অধিক যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়।

বেলায়তের উচ্চ স্থান

মাহবুবে ইয়াযদানী, গাউসুল আলম হযরত সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী সামানী (রঃ) বেলায়তের সর্ব্বোচ্চ স্থান-গাউসিয়ত লাভ করেন। তাঁর এ উচ্চ রোতবা লাভ সর্ম্পকে পূর্ববর্তী অনেক জগদ্বিখ্যাত অলির ভবিষ্যদ্বানীর কথা জানা যায়। যেমন হযরত খাজা কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকী (রঃ) দিল্লীর সুলতান শামসুদ্দিন আলতামাশ এর সময়ে হযরত মাহবুবে ইয়াযদানী (রঃ) এর দাদা হযরত সৈয়দ শামসুদ্দিন মাহমুদ নুর বখশী (রঃ) দিল্লী ভ্রমনে আসলে হযরত বখতিয়ার কাকী (রঃ) তাঁকে বলেন, "আমি আপনাকে সুসংবাদ জানাই যে, আপনার বংশে একজন 'গাউস' এর আবির্ভাব হবে এবং তিনি আমার সিলসিলাকে সম্প্রসারিত করবেন।" সুলতানুল হিন্দ হযরত খাজা মুঈনউদ্দিন চিশতী (রঃ) 'রেসালায়ে গাউছিয়া' নামক কিতাবে অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। হযরত মাহবুবে ইয়াযদানী (রঃ) এর মুর্শিদ হযরত শেখ আলাউদ্দিন 'গঞ্জে নাবাত' (রঃ)-ও তাঁর গাউসিয়তে অধিষ্ঠান সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বানী করেছিলেন।

হযরত নেজামুদ্দিন ইয়ামেনী (রঃ) 'তবকাতে সুফিয়া' নামক কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, হযরত শেখ মুহিউদ্দিন ইবনে আরবী (রঃ) একদা কাবা শরীফে তাওয়াফরত ছিলেন। তিনি দেখলেন যে, একজন লোক অত্যন্ত দ্রুততার সাথে কাবা ঘর তাওয়াফ

করছেন। লোকের প্রচন্ড ভিড়েও তিনি কারো শরীরের স্পর্শ না লাগিয়ে আশ্চর্যজনক ভাবে সবার আগে তাওয়াফ সমাপ্ত করছিলেন। হযরত শেখ ইবনে আরবী (রঃ) এটা দেখে অত্যন্ত অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন- এ ব্যক্তির উপস্থিতি কি শারীরিক না কেবল রূপ-ই শরীরের রূপ ধারন করেছে?

তিনি তাওয়াফ শেষে ঐ ব্যক্তিকে সালাম দিয়ে আলাপে অবগত হলেন যে, তাঁর নাম হযরত আবু বকর ছিবতী। হযরত শেখে আকবর মুহিউদ্দীন ইবনে আরবী তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তিনি জানেন কিনা তখনকার 'গাউস' কে? তিনি বললেন যে, তিনিই সেই ব্যক্তি এবং তাঁর পরবর্তী গাউস হবেন হযরত সৈয়দ জালাল এবং অতঃপর হযরত সৈয়দ আশরাফ।

পৃথিবীতে সর্বদা একজন 'গাউস' বিরাজমান থাকবেন। হযরত রাসুলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগের পর হতে হযরত মাহবুবে ইয়াযদানী (রঃ) পর্যন্ত উনিশ জন গাউস এর জমানা অতিক্রান্ত হয়েছে। হযরত মাহবুবে ইয়াযদানী বিখ্যাত দরবেশ হযরত শেখ এমাদুদ্দিন ইসমাঈল ইবনে শেখ সদরুদ্দীন আসদী (রঃ) এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, গাউসের মাজার শরীফের সঠিক অবস্থিতি গাউস ভিন্ন অন্যদের কাছে গোপন থাকে। তবে গাউসে আজম এবং হযরত মাহবুবে ইয়াযদানী স্বয়ং ও অপর কয়েকজন গাউস সম্পর্কে সর্বসাধারণ অবহিত থাকবে। কিয়ামত পর্যন্ত লোক তাঁদের কাছ হতে ফয়েজ হাসিল করতে সক্ষম হবে। গাউসে আলম হযরত সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী (রঃ) এর এটা এক অনন্য বৈশিষ্ট্য।

পৃথিবীতে যত আউলিয়া কেরামের আবির্ভাব হবে তাঁদের সকলেই কোন না কোন নবীর বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী ধারণ করবেন। যেমন 'কাসিদায়ে গাউসিয়ায়' হযরত মাহবুবে সুবহানী পীরানে পীর মুহিউদ্দীন সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (রঃ) বলেন,-

"(অর্থাৎ প্রত্যেক অলিই কোন একজন নবীর পদাংকে থাকেন এবং আমি স্বয়ং রাসুলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এর পদাংকে রয়েছি) যেমন একদিন গাউসুল আজম (রঃ) এক ওয়াজের মাহফিলে সমবেত শ্রোতাদের সম্মুখে স্বীয় শাহাদাত আঙ্গুলির দিকে দেখিয়ে বলেন, "খোদার কসম, এ আঙ্গুল আবদুল কাদেরের নয় বরং এটা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এর।"

এ সম্পর্কে হযরতের খলীফা কাজী রফিউদ্দীন উদ্হী জানার প্রবল বাসনা নিয়ে হযরতের দরবারে বিনীত প্রার্থনা করেন। তাঁর প্রশ্নের উত্তরে হযরত মাহবুবে ইয়াযদানী (রঃ) বলেন, "এ সম্পর্কে আমিও দীর্ঘদিন সংশয়ে ছিলাম যে, কি জানি কোন নবীর কলবের উপর আমার অবস্থান। অবশেষে এ সম্পর্কে আমি হযরত শেখ নজমুদ্দিন ইস্পাহানী (রঃ) এর কাছে সমাধান চাইলাম এবং তোঙ্গরকুলিকে তাঁর কাছে পাঠালাম। ....আলহামদু লিল্লাহ! আল্লাহ্ তায়ালা আমাকে হযরত ঈসা (আঃ) এর কদম মোবারক পর্যন্ত উপনীত করেছেন এবং আমার কার্যসমূহকে হযরত ঈসা (আঃ) এর বৈশিষ্ট ও ধারায় সমাধা করেছেন।"

হযরত শেখ আবুল অফা খোরাজমী (রঃ) বলেন যে, হযরত মাহবুবে ইয়াযদানী (রঃ) এর অভ্যাস ও কারামত সমূহ থেকেও স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, হযরত ঈসা (আঃ) এর সার্বিক প্রভাব তাঁর উপর বিদ্যমান। যেমন মৃতকে জীবিত করা, কুষ্ঠ রোগীকে সুস্থ করা ইত্যাদি হযরত ঈসা (আঃ) এরই মোজেজা আর এরই বহু প্রতিফলন হযরত মাহবুবে ইয়াযদানী (রঃ) এর প্রকাশিত কারামতে স্পষ্ট হয়।

হযরতের কারামত সমূহ হতে

'কারামত' আউলিয়া কেরামের ইচ্ছা ও অনিচ্ছা উভয় প্রকারে প্রকাশিত হয়। এটা খোদা তায়ালার অপরিসীম কুদরতের নিদর্শনও বটে। হযরত মাহবুবে ইয়াযদানী (রঃ) হতে অসংখ্য কারামত তাঁর জীবনে প্রকাশিত হয়েছে যার ইয়ত্তা নাই। পুস্তকের মধ্যে কয়েকটি আলোচিত হয়েছে। আরো কয়েকটি বিশেষভাবে এখানে বর্ণনা করা যাচ্ছে।

কারামতঃ—১ আল্লাহর অলির সঙ্গে পরিহাসের পরিণাম

জৌনপুর জামে মসজিদে অবস্থান কালে একদা হযরত সিমনানী (রঃ) স্বীয় খলীফা, মুরিদ ও ভক্তগণের সম্মুখে দ্বীনি বিষয়ে আলোচনা করছিলেন। এমন সময় পাঁচজন লোক একটি জীবিত লোককে মৃত সাজিয়ে খাটিয়ায় শুইয়ে হযরতের সম্মুখে এসে অনুরোধ করল লোকটির জানাজার নামাজ পড়িয়ে দিতে। প্রকৃত পক্ষে ঐ লোকগুলি ভাঁড় প্রকৃতির এবং তারা হযরতের সাথে পরিহাসের উদ্দেশ্যে জীবিত লোককে লাশ

সাজিয়ে এনেছে। হযরত যখন নামাজে দাঁড়াবেন তখন খাট হতে লোকটি নেমে পালাবে এবং হাসির একটা খোরাক হবে।

হযরত মাহবুবে ইয়াযদানী তখন জনৈক খলীফাকে নামাজ পড়িয়ে দেয়ার নির্দেশ দিয়ে বললেন, 'জানাজা ফরজে কেফায়া তাই সবাই যাওয়ার প্রয়োজন নাই।' হযরত পূর্বের ন্যায় আপন কার্যে রত রইলেন।

এদিকে পাঁচ জনের মধ্যে একজন মূর্দার ওয়ারিশ হয়ে জানাজার অনুমতি দিল। হযরতের নিযুক্ত ব্যক্তি যখন জানাজার জন্য প্রথম তকবীর পাঠ করে কান পর্যন্ত হাত উঠালেন, তখন শায়িত লোকটির রূহ দেহ ত্যাগ করে গেল। নামাজ শেষে হযরতের খলীফা বললেন, যাও! লাশ নিয়ে যাও।

এমন অবস্থায় সঙ্গী লোক পাঁচজন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল। হযরত মাহবুবে ইয়াযদানী (রঃ) তাদেরকে নির্দেশ দিলেন, 'আর কি, যাও, লাশ নিয়ে মাটিতে দাফন করে দাও'। এভাবে মাহবুবে ইয়াযদানীর সঙ্গে ঠাট্টা করার ফল হাতে হাতেই পেয়ে গেল। (নাউজুবিল্লাহ) আল্লাহর অলিগণের সঙ্গে পরিহাস করার ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে এটি একটি অন্যতম দৃষ্টান্ত।

কারামতঃ—২ অহংকারী দরবেশের অবস্থা

একদিন চান্দীপুরের ভড়হড় নামক স্থানে হযরত মাহবুবে ইয়াযদানী জুমার নামাজ আদায়ের লক্ষ্যে তশরীফ নিয়ে গেলেন। সেস্থানে শেখ জাহেদ নামে একজন বুযর্গ ছিলেন। তিনি অনাড়ম্বর দরবেশী জীবন যাপন করতেন এবং লোকজন তাঁকে খুব ভক্তি করত। তাঁর একটি কারামত অতি প্রসিদ্ধি লাভ করে যে, অধিকাংশ রাতের কালে তিনি স্বীয় কক্ষ হতে বের হয়ে গিয়ে সমুদ্রের মাঝে জায়নামাজ বিছিয়ে এবাদত করতেন।

হযরত মাহবুবে ইয়াযদানী (রঃ) শেখ জাহেদ এর সাথে সাক্ষাৎ লাভের ইচ্ছা নিয়ে সেখানে গিয়ে দেখতে পেলেন শেখ জাহেদ সমুদ্রের মধ্যে জায়নামাজ বিছিয়ে নামাজ পড়ছেন। হযরত মাহবুবে ইয়াযদানীও সমুদ্রে পা রাখলেন এবং শেখ জাহেদের নিকটে গিয়ে তাঁর পিঠে অতি মমতাভরে নিজ হাত স্থাপন করলেন এবং বলতে লাগলেন 'আপনার উপর খোদা তায়ালার রাহমত বর্ষিত হোক, আপনি আমার শুভেচ্ছা নিন! কেননা আপনি আধ্যাত্মিকতা ও পার্থিক জৌলুসের এমন সমন্বয় সাধন করেছেন যা সত্যিকার বুযর্গগণের জন্যই সম্ভব'।

শেখ জাহেদী স্বীয় বুযর্গী নিয়ে পূর্ব হতেই অহংবোধে আচ্ছন্ন ছিলেন। তাই তিনি নিজের জৈষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করার জন্য মাহবুবে ইয়াযদানীর দোয়ার উত্তরে তাঁর পিঠের উপর হাত রেখে দোয়া বাক্য উচ্চারণ করতে লাগলেন।

শেখ জাহেদীর এ ধরনের অহংকারী আচরণে হযরত মাহবুবে ইয়াযদানী নাখোশ হলেন। তিনি এরশাদ করলেনঃ "হিন্দুস্থানের লোকগুলিতো আশ্চর্যরকম উদ্ধত ও বেয়াদব! সামান্য কারামতের কারণেই কেমন অহংকারী হয়ে যায়। এরূপ ব্যক্তিরা অল্প দিনেই হারিয়ে যায়।"

এ ঘটনার পর শেখ জাহেদীকে আর কেউ দেখেনি! আল্লাহই জানেন তাঁর কি হয়েছিল, কিন্তু তিনি সবার নিকট হতে গায়েব হয়ে যান। তাঁর কবরেরও কোন হদিস নাই।

কারামতঃ-৩ জলোচ্ছাস বন্ধ হয় অলিগণের অসিলায়

একদা হযরত সফরোপলক্ষে এক স্থানে উপনীত হন। এখানে প্রতিবছর সামুদ্রিক জলোচ্ছাসের ফলে লোকজন যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়, তাদের ফসলাদি ধ্বংস হয়। হযরত যখন সেখানে আসেন সে বছর জলোচ্ছাসে অন্যান্য সময়ের তুলনায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়। তাই হযরত এখানে এসে পৌঁছলে মুসলমান অধিবাসীগণ সকলে হযরতের কাছে দোয়ার জন্য অনুরোধ করতে লাগলেন।

তাদের বারংবার অনুনয়ের ফলে হযরত মাহবুবে ইয়াযদানীর অন্তরে তাদের জন্য দয়া সঞ্চারিত হলো। তিনি একখন্ড কাগজ আনিয়ে সেখানে স্বহস্তে লিখলেনঃ- "হে নদী! আল্লাহর বান্দা আশরাফ সিমনানীর পক্ষ হতে তোমাকে অবগত করানো যাচ্ছে যে, তোমার জলোচ্ছাস যদি খোদার নির্দেশে হয়ে থাকে তবে তোমার উচিত খোদার নির্দেশানুযায়ী তোমাকে যে সীমানা চিহ্নিত করে দেয়া যাচ্ছে তা অতিক্রম না করা।" অতঃপর সেটি পানিতে ফেলে আসা হলো এবং একস্থানে একটি পাথর খন্ড দ্বারা চিহ্ন স্থাপন করে দিলেন। এভাবে হযরত মাহবুবে ইয়াযদানী তাদেরকে চিরতরে প্লাবন হতে পরিত্রাণ দিলেন। এরপর আর কখনো জলোচ্ছাসে ক্ষতি হয়নি।

কারামতঃ-৪ হজ্ব করার বাসনা পূরণ

একজন বৃদ্ধলোক হযরত গাউসুল আলম মাহবুবে ইয়াযদানীর (রঃ) সামনে উপস্থিত ছিল। সে দিন ছিল জিলহজ্বের ৮ তারিখ-'ইয়াওমে আরাফাহ' (আরাফাতে

হাজীগণের জমায়েত দিবস) বৃদ্ধটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে অনেকটা আপন মনে বলতে লাগল, হায়! হাজীগণ হয়ত কাবা শরীফে পৌছে গেছেন। কতই না ভাল হতো যদি আমারও সে সৌভাগ্য হতো। বাসনা থাকলেও বৃদ্ধ লোকটির হজ্বে যাওয়ার সামর্থ ছিলনা। সে ছিল কপর্দক শূন্য। কিন্তু হযরত গাউসুল আলম সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর বৃদ্ধের কথা শুনে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, সে সত্যই হজ্বে আগ্রহী কিনা। বৃদ্ধটি বললঃ 'সে সৌভাগ্য যদি হতো তবে কতই না উত্তম হতো!'

হযরত তাকে কাছে ডাকলেন এবং বললেন, 'তবে যাও'। বলা মাত্রই লোকটি নিজেকে কাবা শরীফে আবিষ্কার করল এবং হজ্ব আদায় করে তিন দিন কাবা শরীফে অবস্থান করল। হঠাৎ মনে মনে ভাবল যে, যদি কেউ তাকে পূনরায় নিজদেশে পৌছে দিত! ভাবনা মাত্র সে দেখল তার সামনে হযরত মাহবুবে ইয়াযদানী। সে হযরতকে দেখে তাঁর পায়ে উপুড় হয়ে পড়ল। হযরত পবিত্র জবান দিয়ে শুধু উচ্চারন করলেনঃ 'যাও'। কিছুক্ষন পর মাথা তুলতেই বৃদ্ধ হতবাক! সে এখন নিজ দেশে ঘরে! সুবহানাল্লাহ্।

কারামতঃ-৫ মেধা ও প্রতিভা দান করলেন গাউসুল আলম

বিশ্ববিখ্যাত 'শায়ের' (কবি) হযরত খাজা আমীর খসরুর (রঃ) নাম জানেন না, এমন লোক বিরল। হযরত মাহবুবে এলাহী শেখ নেজামুদ্দিন (রঃ) এর সাচ্চা আশেকগণের অন্যতম ছিলেন হযরত আমীর খসরু। তাঁর উপাধি 'সুলতানুশ শোয়ারা' (শায়েরকুলের সুলতান)। তাঁর বিরল কবি প্রতিভার উত্তরাধিকার তাঁর পরবর্তী উত্তরাধিকারীগণও পেয়েছিলেন।

হযরত আমীর খসরুর পুত্র শেখ আহমদ খলিলও ছিলেন পিতার ন্যায় একজন শীর্ষস্থানীয় কবি। তাঁর এক পুত্র নিয়ে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত ছিলেন। হাজার রকমের চেষ্টা সত্বেও ঐ পুত্রের মধ্যে কবি প্রতিভার চিহ্নমাত্র দেখতে না পেয়ে তিনি দুঃখ ও হতাশায় ভুগতে লাগলেন।

হযরত সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর (রঃ) যখন এখানে আসেন তখন শেখ আহমদ খলিল তাঁর সম্মানে এক প্রীতিভোজের ব্যবস্থা করেন। শহরের সকল বুযর্গ ও সম্মানিত ব্যক্তিও আমন্ত্রিত ছিলেন। আহারান্তে শেখ খলিল স্বীয় পুত্রকে হযরতের সম্মুখে উপস্থিত করে বলতে লাগলেন যে, ছেলেটি নিতান্ত মেধাহীন। হাজার চেষ্টা সত্বেও কবিতা সম্পর্কে বিন্দুমাত্র যোগ্যতা তার মধ্যে জমানো যায়নি। হুজুর যদি সদয় দৃষ্টি প্রদান করেন-এই আশায় আবেদন পেশ করা গেল।

হযরত মাহবুবে ইয়াযদানী কিছুক্ষণ নিরব থাকার পর বললেন, 'এ ছেলেকে মেধাহীন বলে কে? আর যোগ্যতাতো পিতার চাইতেও অধিক দেখা যাচ্ছে।' হযরতের পবিত্র জবানে এ কথা উচ্চারিত হবার সাথে সাথে আমীর খসরুর দৌহিত্রের মধ্যে কাব্যের যোগ্যতা জন্মলাভ করল এবং উপস্থিত সবাই তার প্রতিভার প্রমাণ হাতে হাতে পেয়ে গেল। অতঃপর হযরত মাহবুবে ইয়াযদানী (রঃ) এরশাদ করলেন, "কবিতা ও বাগ্মিতা তোমার বংশীয় উত্তরাধিকার হওয়া সত্বেও কেন তুমি কবিতা চর্চা করনা?" হযরতের এ কথা শুনে তিনি তৎক্ষণাৎ কয়েকটি কবিতার লাইন রচনা করে সবার সামনেই আবৃত্তি করে শুনালেন। হযরতের শানেও তিনি কয়েক ছত্র সবাইকে পড়ে শুনালেন। এভাবে আল্লাহর অলি মেধাহীনকে মেধাবী এবং যোগ্যতাহীনকে যোগ্যতাসম্পন্ন করে দিলেন।

কারামতঃ—৬ অলির কৃপাদৃষ্টিতে বিড়ালও জজবা সম্পন্ন হয়

হযরত গাউসুল আলম সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর ভক্ত মুরিদগণের সামনে বিশ্ববিশ্রুত অলি হযরত নাজমুদ্দীন কোবরা (রঃ) এর সমুন্নত মর্যাদা ও রোতবা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে একদিন বললেন যে, হযরত নাজমুদ্দিন কোবরা (রঃ) বেলায়তের দৃষ্টি প্রদান করে একটি কুকুরকে জজবাসম্পন্ন পরিণত করেছিলেন। একথা শুনে হযরত গাউসুল আলমের খলিফা কাজী রফিউদ্দিন মনে মনে ভাবতে লাগলেন, এ যুগেও কি তেমন 'অলি' বিরাজ করছেন যিনি জীবজন্তুকে 'জজবাসম্পন্ন পরিণত করতে পারেন? হযরত গাউসুল আলম মাহবুবে ইয়াযদানী (রঃ) কাজী রফিউদ্দিন সাহেবের অন্তরের ভাবনা বুঝতে পেরে হেঁসে উঠে বললেন, 'সম্ভবতঃ এ জগতে সে রকম কেউ অবস্থান করছেন।' এরপর তিনি স্বীয় মুরিদ কামালযোগীর (তার পরিচিতি কিতাবে উল্লেখিত) পোষা বিড়ালকে আনার নির্দেশ দিলেন। বিড়ালটি হযরতের সামনে আনা হলো। এ সময় তিনি আধ্যাত্মিক জবানের বিভিন্ন রহস্য আলোচনা করছিলেন। এক পর্যায়ে হযরতের চেহারা মোবারকে অস্বাভাবিক উত্তেজনার ছাপ ফুটে উঠল এবং চেহারার রং পরিবর্তিত হলো। উপস্থিত সকলের মন অজানা আশংকা ও উৎকণ্ঠায় ভরে উঠল। মনে হচ্ছিল হযরতের কলব হতে যেন রূহ বের হয়ে যেতে চায়! এ অবস্থায়ও হযরত আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিলেন এবং বিড়ালটি কান লাগিয়ে তন্ময় হয়ে হযরতের আলোচনা শুনে যেতে লাগল। এক সময় বিড়ালটি বেহুঁশ হয়ে পা ভেঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল এবং দীর্ঘক্ষণ বেহুঁশ অবস্থায় থাকার পর হুঁশ এলে হযরত মাহবুবে ইয়াযদানীর পা চুম্বন করতে লাগল এবং তাঁর চারদিকে

ঘুরতে লাগল। এরপর থেকে হযরত কোন আলোচনার উদ্যোগ নিলে বিড়ালটি নিয়মিত মজলিশে এসে উপস্থিত থাকত এবং শুনত।

বিড়ালটিকে খানকায় একটি দায়িত্ব দেয়া হয় যা সে সর্বদা বিশ্বস্ততার সাথে পালন করে। খানকা হতে কোন মেহমানের আগমন হলে বাবুর্চিকে গিয়ে বিড়ালটি মেহমানের সংখ্যানুযায়ী ততবার আওয়াজ করে সংবাদ দিত। এছাড়া মাহবুবে ইয়াযদানী (রঃ) কাউকে প্রয়োজন পড়লে বিড়ালকে বললে সে গিয়ে তার সামনে আওয়াজ করত। লোকটি তাতে বুঝত যে, হযরত আহবান করেছেন। একদিন খানকা শরীফে দরবেশদের একটি মুসাফির দল মেহমান হলেন। বিড়ালটি নিয়ম মতো গিয়ে বাবুর্চিকে সংখ্যানুযায়ী আওয়াজ দিয়ে তা জানিয়ে দিল। কিন্তু আহার পরিবেশনের সময় দেখা গেল বিড়ালের গণনা হতে একজন লোকের সংখ্যা বেশী হচ্ছে। তখন বিড়ালের দিকে লক্ষ্য করে হযরত মাহবুবে ইয়াযদানী (রঃ) বললেন, 'আজ তার কি হলো, সে ভুল করল কেন? কেন সে একজন লোকের ব্যাপারে অবহিত করা হতে বিরত রইল?'

হযরতের এ কথা শুনে বিড়াল তৎক্ষণাৎ মেহমানদের কক্ষে গমন করল এবং উপস্থিত সবার গায়ে নাক লাগিয়ে গন্ধ শুঁকে যেতে লাগল। এভাবে শুঁকতে শুঁকতে তাদের মধ্য হতে একজনের জানুতে গিয়ে বসল এবং প্রস্রাব করে দিল। তার এমন আচরণে সকলে স্তম্ভিত হয়ে গেল। কিন্তু হযরত মাহবুবে ইয়াযদানী তখন বললেন, হাঁ, বিড়ালের সত্যিই কোন অপরাধ নাই; কারণ উক্ত ব্যক্তি অনাহুত এবং ছদ্মবেশধারণকারী। তখন উক্ত ব্যক্তিটি উঠে হযরতের কাছে এসে তাঁর পা ধরে বলতে লাগল, "আমি একজন নাস্তিক। বার বছর যাবৎ দরবেশের পোষাকে বুযর্গগণের খানকাহ সমূহে গিয়েছি, ঘুরেছি। আমার উদ্দেশ্য হলো কেউ যদি আমার ছদ্মবেশ ধরতে পারেন তবে তাঁর হাতে হাত রেখে মুসলমান হয়ে যাব। আজ আপনার পোষা বিড়াল আমার সে বেশ উন্মোচন করল। এখন আমি খালেস দিলে তওবা করছি এবং ইসলাম কবুল করছি।"

সুবহানাল্লাহ! হযরতের নেগাহ ও করমের প্রভাবে একটি পোষা বিড়ালও বিরল যোগ্যতার অধিকারী এবং হক ও বাতিলের পার্থক্য সনাক্তকারী। সে নাস্তিক ব্যক্তিটি পরে হযরতের কাছে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মুরিদ হন। হযরত তাঁকে পরিপূর্ণ রিয়াজত ও বাতেনী পবিত্রতা অর্জনের পরে খলীফা হিসাবে মনোনীত করেন এবং দ্বীনি খেদমত দানের জন্য ইস্তাম্বুলে প্রেরণ করেন।

সে বিড়ালটি খানকা শরীফে উক্ত দায়িত্বে আরো বহুদিন ছিল। শেষে এক ঘটনায় খানকা বাসীদের জীবন রক্ষার জন্য স্বীয় জীবনই উৎসর্গ করেছিল। এ ঘটনাও অতিব গুরুত্বপূর্ণ। একদিন বাবুর্চিখানায় দুধের বড় পাত্রে দুধ গরম করা হচ্ছিল। পাত্রের মুখ খোলা থাকায় ছাদ হতে একটি বিষাক্ত কাল সাপ সকলের অগোচরে দুধের পাত্রে পতিত হয়। বিড়ালটি সেটা জানতে পারে এবং বারংবার দুধের পাত্রের চারদিকে ঘুরতে থাকে এবং বাবুর্চির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করে। বাবুর্চি সে ইঙ্গিত ধরতে পারলনা। বাবুর্চি মনে করল দুধ পানের উদ্দেশ্যে বিড়াল এমন আচরণ করছে। বাবুর্চি তাই বিড়ালের ডাকে কান দিলনা। বিড়াল বাবুর্চির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হয়ে ভাবতে লাগল যে, বাবুর্চি আমার ইঙ্গিততো বুঝতে পারছে না। এ দিকে এ দুধগুলি যখন খানকার ফকির দরবেশদের মধ্যে বণ্টন করা হবে তখন তো বিষাক্ত মৃত সাপের বিষের প্রতিক্রিয়ায় সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হবে। তাই বিড়ালটি সে দুধের মধ্যে ঝাপ দিয়ে পড়ে 'শহীদ' হয়ে গেল। ফকির দরবেশদের জীবন রক্ষার জন্য বিসর্জন দিল নিজ জীবন। পরে দুধের পাত্র হতে দুধ ফেলে দেয়ার সময় সকলে ঘটনা বুঝতে পারল, কেন বিড়ালটি এভাবে জীবন উৎসর্গ করল! পাত্রে তখন বিড়াল ছাড়াও ছিল সে কাল সাপের মৃতদেহ।

পরে হযরত নূরুল আইনের (রঃ) নির্দেশে তাকে সসম্মানে মাটির নিচে দাফন করা হয় এবং তার জন্য তৈরী করা হয় কবর। কবরটির অবস্থান দরবারের পূর্ব দিকে। কারো উপর জ্বীন বা শয়তানের 'আছর' (প্রভাব) হলে তাকে যদি এ বিড়ালের কবরে উপস্থিত করা হয় তবে আক্রান্ত ব্যক্তি চিৎকার করতে থাকে-"বিবি গোরবা (বিড়ালটির নাম) আমাকে থাবা মারছে, আমি তওবা করছি, আর কখনো এ ব্যক্তিকে কষ্ট দেবনা।" এর জ্বলন্ত প্রমাণ পাবেন যে কেউ; যদি সেখানে যান। এরূপ অসংখ্য আক্রান্ত ব্যক্তি এখানে খোদার ফজলে সুস্থ হয়ে ফিরছেন। [১]

কারামতঃ-৭ মরণাপন্ন বালককে নতুন জীবন দান

দামেশকে হযরত মাহবুবে ইয়াযদানী অবস্থানরত ছিলেন বেশ কিছুদিন যাবৎ। বিভিন্ন ঘটনায় তাঁর বহু কারামত এখানে প্রকাশিত হয় যার ফলে সর্বত্র তাঁর কথা ছড়িয়ে পড়ে। লোকজন তাঁর শরাফত, জ্ঞানের গভীরতা, বেলায়তের উচ্চ মর্তবা সম্পর্কে অবহিত হয়ে তাঁর সান্নিধ্যে এসে ধন্য হতে থাকে। একদিন তিনি দামেশকের জামে মসজিদের চত্বরে বসা ছিলেন। এমনি সময় আলুথালু বেশে একজন অসামান্য সুন্দরী যুবতী বার বছরের কিশোর সন্তান নিয়ে হযরতের খেদমতে উপস্থিত হয়ে তাঁর সামনে

(১) হযরত মাহবুবে ইয়াযদানীর (রঃ) ওফাতের পর হযরত নূরুল আইন (রঃ) এর খেদমতেও বিড়ালটি কিছুদিন ছিল।

উপুড় হয়ে পড়ল। কিশোরটি ভয়ানক অসুস্থ ছিল। চিকিৎসকগণ তার ব্যাপারে আশা ছেড়ে দেয়ায় মা তার মরণাপন্ন সন্তান নিয়ে হযরতের দরবারে উপস্থিত হয়েছে।

হযরত কিশোরপানে তাকিয়ে যুবতীটিকে লক্ষ্য করে বললেন যে, এ সন্তানের আয়ু খুবই স্বল্প আর মৃতকে জীবিত করাতো হযরত ঈসা (আঃ) এরই মোজেজা ছিল। সুতরাং একে বাঁচানো সম্ভবপর নয়।

কিন্তু সন্তানের মা হিসাবে যুবতী সীমাহীন অস্থির, অবোধ এবং নাছোড়বান্দা। তাই হযরতের সমীপে নিবেদন করল যে, আল্লাহর অলিগণ বহুজনকে জীবন দান করেছেন।

কেননা তাঁরা এদিক দিয়ে হযরত ঈসা (আঃ) ও হযরত খিজির (আঃ) এরই প্রকাশমান। এভাবে যুবতীটির ব্যাকুলতা ও অস্থিরতা দেখে হযরত মাহবুবে ইয়াযদানী আর থাকতে পারলেন না। তিনি মোরাকাবা ও মোশাহাদায় গিয়ে চক্ষু বন্ধ করলেন। অল্পক্ষণ পরে মাথা তুললেন এবং কিশোর সন্তানের দিকে ফিরে এরশাদ করলেন, 'আল্লাহর নির্দেশে দন্ডায়মান হও।' বলা মাত্র মরণাপন্ন কিশোর উঠে দাঁড়াল এবং হাঁটাচলা আরম্ভ করল। (সুবহানাল্লাহ!)।

কারামতঃ-৮ কুষ্ঠরোগ হতে আরোগ্য লাভ

হযরত মাহবুবে ইয়াযদানীর (রঃ) জওহার নামীয় একজন মুরিদের শরীরে একদা কুষ্ঠ রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেলে সে অত্যন্ত ম্রীয়মান ও সংকুচিত হয়ে গেলো এবং লোকজনের সংস্পর্শ হতে দূরে সরে যাওয়ার মনস্থ করে হযরতের খেদমতে অনুমতি প্রার্থনা করল। কেননা কেউ এ রোগে আক্রান্ত হলে সে যুগে তাকে শহর হতে বের করে দেয়া হতো। খোরাসানেও এ ধরনের রোগী লোকালয়ে থাকতে পারত না।

কিন্তু জওহার হযরতের বিচ্ছেদ বেদনায়ও অত্যন্ত মুষড়ে পড়ে। তার হৃদয় খান খান হয়ে যাচ্ছিল হযরতের অমূল্য সাহচর্য এবং অমীয় বাণী শুনা হতে বঞ্চিত হতে হবে ভেবে।

হযরতও তাকে খুব ভালবাসতেন। কেননা সে ছিল একজন ভাল কবি ও সুবক্তা। তার কবিতা শুনে হযরতও প্রীত হতেন। তাই হযরত মাহবুবে ইয়াযদানীর সামনে তার বিদায়ের অনুমতি প্রার্থনা এবং বিচ্ছেদ বেদনার কাতরতা প্রকাশ পেলে হযরত নিজেও তার জন্য ব্যথিত হলেন। মাহবুবে ইয়াযদানী তাকে বিদায়ের অনুমতি প্রদানের পরিবর্তে একটি পাত্র ভরে পানি আনলেন এবং তাতে স্বীয় মুখ হতে সামান্য থুথু

দিলেন। অতঃপর সে পানি জওহার কিছু পান করল এবং অবশিষ্ট শরীরে ঢেলে দিল। দেখতে না দেখতেই শরীরের সে কুষ্ঠরোগের সাদা দাগগুলি মিলিয়ে গেল। খোদা তায়ালার অপরিসীম মেহেরবাণীতে আল্লাহর অলির বদৌলতে তৎক্ষণাৎ জওহার কুষ্ঠ রোগ হতে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয়ে গেল।

কারামতঃ-৯ সন্তান লাভ করল অলির দোয়ায়

একদিন হযরত মাহবুবে ইয়াযদানী (রঃ) সিকান্দরপুর নামক স্থানে তশরীফ আনেন। আসার পর হযরত স্বীয় সাথীগণকে বলতে লাগলেন যে, এ গ্রাম হতে তিনি নবী বংশের সুবাস পাচ্ছেন। হযরত আসার সংবাদ শুনে উক্ত স্থানের মালিক সৈয়দ জামাল উদ্দিন হযরতের সাক্ষাত লাভের জন্য উপস্থিত হলে হযরত এরশাদ করেন, সুবাস আরো তীব্র হয়ে নাকে লাগছে। সৈয়দ জামাল উদ্দিন হযরতের সাথে সাক্ষাত করে খুবই প্রীত হলেন। হযরতের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধা জন্ম নিল। তাই প্রায়শই তিনি তাঁর খেদমতে উপস্থিত হতে লাগলেন।

এদিকে তিনি মনে মনে স্থির করলেন হযরতের কাছে দোয়া চাইবেন অধিক সন্তান লাভের জন্য। কেননা তাঁদের বংশে উর্ধতন কয়েক পুরুষ হতে একটি অধিক সন্তান জন্মাতনা। তিনি যখন দোয়া চাইতে এলেন তখন মনে মনে ভাবছিলেন যে, এবার হযরত মাহবুবে ইয়াযদানী (রঃ) হতে দোয়া নিবেন এবং পরে অন্য বুযর্গের সাক্ষাৎ পেলে তাঁর কাছেও এজন্য দোয়া চাইতে ভুলবেন না।

হযরত মাহবুবে ইয়াযদানীর নিকট তাঁর মনের সুপ্ত ভাবনা গোপন রইলনা। তিনি এরশাদ করলেন, "তোমার প্রতি আমার শুভেচ্ছা রইল। চিন্তা করোনা, অনেক সন্তান সন্ততি জন্ম নেবে। এ ব্যাপারে আর কারো নিকট যাওয়ার প্রয়োজন নাই এবং নিজের অবস্থা আর কারো নিকট প্রকাশ না করাই উত্তম হবে। প্রচুর ধন সম্পদও আল্লাহ তায়ালা তোমাদের দান করবেন।" বস্তুতই হযরতের কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়।

হযরত মাহবুবে ইয়াযদানী সৈয়দ জামাল উদ্দিন সম্পর্কে ভাল ধারণা ও মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, "সৈয়দ জামাল উদ্দিন হুবহু আখেরী নবী হুজুর পুরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এর একই চেহারার অধিকারী। তাঁকে যে ব্যক্তি দেখবে সে যেন হুজুর পুরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এর নূরানী চেহারার সৌন্দর্য দেখার সৌভাগ্যশালী হলো।"

কারামতঃ-১০ আয়ুহীন মরণযাত্রীকে দশ বছর হায়াত দান

সেই সিকান্দরপুরেই একদিন এক বৃদ্ধা তার মৃত্যুপথযাত্রী এক সন্তান নিয়ে এসে হযরত মাহবুবে ইয়াযদানীর পায়ে পড়ল এবং বলতে লাগল, "হুজুর! এটিই আমার একমাত্র সন্তান, আল্লাহরই ইচ্ছায় আজ সে মরণযাত্রী। দয়া করে তার জন্য দোয়া করুন।"

হযরত তখন জবাব দিলেন, 'এ সন্তানের আয়ুতো বেশী দেখছিনা'। তখন বৃদ্ধা বলল, 'হুজুর! আমি অতশত বুঝিনা। আমার সন্তান যদি মাথা না তুলে তবে আমি আজ হযরতের সামনে এ প্রাণও দিয়ে দেব।'

ব্যাকুল মায়ের এমন কথা শুনে হযরত বললেন, 'ঠিক আছে, আমাকে আল্লাহ তায়ালা একশো বিশ বছরের আয়ু দান করেছেন। আমি নিজ জীবনের আয়ু হতে দশ বছর তোমার সন্তানকে দান করছি। আজকের তারিখ লিখে রাখ। ঠিক দশ বছর পর্যন্ত তোমার সন্তান জীবিত থাকবে।' এরপর বৃদ্ধা সুস্থ সন্তান নিয়ে খুশী মনে ফিরে গেল।

কারামতঃ-১১ সরীসৃপ মান্য করে আল্লাহর অলিগণকে

হযরতের বিশিষ্ট খলিফা হযরত আবুল মকারিম বর্ণনা করেন যে, একদিন হযরত জঙ্গলের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন সঙ্গীসাথীসহ সফরোপলক্ষে। এ সময় তিনি দীর্ঘ সফরে বলখ হতে শেরওয়া হয়ে হিরাতের দিকে আসছিলেন। জঙ্গলের উক্ত পথটিতে বড় অজগর ও বিষাক্ত সাপের বড় বেশী উৎপাত ছিল। তাই সাথীরা হযরতকে সে পথে না যাওয়ার জন্য সাবধান করলে হযরত বললেন যে, ইনশাল্লাহ কোন অসুবিধা হবেনা।

এদিকে কিছুদূর যাওয়ার পর একটি বড় অজগরকে দেখা গেল পথ আটক করে অবস্থান করছে। কাফেলা দাঁড়িয়ে গেল বাধ্য হয়ে। হযরত তখন এগিয়ে গিয়ে স্বীয় লাঠি মোবারক দিয়ে সাপের দিকে ইঙ্গিত করে এরশাদ করলেন, 'হে অজগর! তুমি নিরীহ ফকিরদের পথ কেন আটকে আছ? পথ ছাড় এবং সরে যাও।' অজগর সাপ সে কথা শুনে পথ ছেড়ে সরে গেল এবং কাফেলা পুনরায় সামনে যাত্রা করল।

কারামতঃ-১২ বিপথগামী মুরিদকে রক্ষা করেন মুর্শিদে করীম

হিরাতে এসে হযরত কয়েকদিন অবস্থানের সিদ্ধান্ত নিলেন। একদিন গওহার আলী নামে হযরতের এক মুরিদ হিরাতের বাজারে গেলেন প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে। সেখানে

তিনি এক অসামান্য সুন্দরী যুবতীকে দেখতে পেয়ে তার প্রতি আসক্তি বোধ করলেন এবং যুবতীর সাথে আলাপের চেষ্টা করলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই তাঁর মধ্যে আল্লাহর ভয় জাগল এবং তিনি তওবা ও খোদার কাছে গুনাহর জন্য ক্ষমা চাইতে চাইতে বিমর্ষ বদনে হযরতের সামনে উপস্থিত হলেন। এদিকে হযরত তাকে দেখা মাত্র চেহারা মোবারক ফিরিয়ে নিলেন এবং ক্রোধান্বিত হয়ে বললেন, 'এই আহাম্মককে সবাই দেখ, সে বাজারে গিয়ে যুবতীদের সাথে আলাপের চেষ্টা করে।' অতঃপর হযরত হুকুম দিলেন তাকে মজলিশ হতে বের করে দেয়ার জন্য। নির্দেশ প্রতিপালিত হলো।

দিন কয়েক অতিবাহিত হলো। গওহার আলী অবশেষে হযরতের বিশিষ্ট অনুচর হযরত দুররে ইয়াতীমের স্মরণাপন্ন হয়ে তাঁকে অনেক অনুনয় বিনয় করে সুপারিশ করতে সম্মত করালেন। তিনি হযরতের দরবারে গওহার আলীর জন্য সুপারিশ করলে হযরত ক্ষমা করে দিলেন। হযরত বলতেন যে, মুর্শিদ ও পথ প্রদর্শক হাদীগণের জন্য স্বীয় মুরিদ ও ভক্তদের অবস্থাদি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকার প্রয়োজনীয়তা আবশ্যক, যাতে সে শরীয়ত ও তরিকতের পরিপন্থী কোন কার্যে লিপ্ত হয়ে না যায় এবং শয়তানের কুমন্ত্রনা হতে সে বেঁচে থাকে।

কারামতঃ-১৩ লোহা হলো স্বর্ণখন্ড

কোন এক সফরে হযরত শ্রীলংকার এক স্থান দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। এ অবস্থায় একটি বড় জংগল পড়ে গেল। বহুদূর পর্যন্ত কোন জনবসতি ছিলনা। এদিকে রসদপত্র ফুরিয়ে গেল। ফলে কাফেলার মধ্যে অনেকেই কয়েকদিন যাবৎ আহার্য ও পানীয়ের অভাবে কাহিল হয়ে পড়লো। এ অবস্থা দেখে হযরত একজনকে বললেন, একটা লৌহ খন্ড জোগাড় করে নিয়ে এসো। জনৈক ব্যক্তির কাছে লোহার শেকল ছিল সে তা হযরতের সামনে পেশ করল।

হযরত মাহবুবে ইয়াযদানী (রঃ) এক দৃষ্টে সে শেকলের দিকে অল্প সময় তাকিয়ে রইলেন। দেখা গেল-সেটি স্বর্ণে পরিণত হয়ে গেছে। অতঃপর বাবা হোসাইন নামীয় জনৈক খাদেমকে বললেন, 'যাও! এখান থেকে কিছুদূর গেলেই 'সওকুল মজানীন' নামক একটা বাজার দেখতে পাবে। সেখানে গিয়ে স্বর্ণখণ্ডটি ভাঙ্গিয়ে তিন দিনের জন্য রসদাদি ক্রয় করে আন এবং এরপর স্বর্ণখণ্ড অবশিষ্ট থাকলে তা পানিতে ফেলে দেবে।'

বাবা হোসাইন নামীয় উক্ত খাদেম হযরতের নির্দেশ মোতাবেক 'সওকুল মজানীন' (মজনুনগণের বাজার) এ উপস্থিত হলো। কিন্তু তার অবাক হবার পালা। কেননা সে দেখতে পেল, হযরতের বিশিষ্ট অনুচর 'দুররে ইয়াতীম' একটি চাবুক হাতে দণ্ডায়মান থেকে বাজারের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালন করছেন। 'দুররে ইয়াতীম' সে সময় হযরতের আস্তানাতেই থাকার কথা। কেননা তাঁর উপর সেখানকার দেখাশুনা করার দায়িত্ব অর্পিত ছিল। তাঁকে দেখে তাই বাবা হোসাইন আশ্চর্যান্বিত হলো। হযরত দুররে ইয়াতীম তাকে লক্ষ্য করে বললেন, 'তুমি আল্লাহর অলিগণের কার্যাদির কি হদিস পাবে! চক্ষের পলকে তাঁরা অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারেন। যে কোন স্থানে গমনাগমন করতে পারেন। হযরত মাহবুবে ইয়াযদানী আমাকে 'সওকুল মজানীন' এর দায়িত্বভার ন্যস্ত করেছেন বিধায় আমি চাবুক হাতে এখানে উপস্থিত হয়েছি। আল্লাহর অলিগণের মধ্যে কারো আহার্য প্রয়োজন হলে এখানে তাঁরা আসেন এবং পছন্দ মাফিক খাদ্য গ্রহণ করেন। আর যদি কেউ তাঁদের সাথে অসাদাচরণ করে বা তাঁদের মর্জির পরিপন্থী কোন কাজ করে তবে আমি চাবুক দিয়ে তাকে শায়েস্তা করতে নিয়োজিত। তুমি যে কাজে এসেছ তা সম্পাদন করে ফিরে যাও। তোমার জন্য মাহবুবে ইয়াযদানী অপেক্ষারত'। বাবা হোসাইন প্রয়োজন মাফিক রসদপত্র ক্রয় করে এসে হযরতের দরবারে উপস্থিত হয়ে বলল যে, হযরতের নির্দেশমত তিনদিনের রসদ পত্রাদি ক্রয়ের পর অবশিষ্ট স্বর্ণ পানিতে নিক্ষেপ করা হয়েছে।

এদিকে আমির তোঙ্গরকুলি নামক একজন সহচর মনে মনে ভাবতে লাগল যে, স্বর্ণগুলি নষ্ট না করে কোন নিঃসকে প্রদান করলেই তো ভাল হতো। এ কথা চিন্তা করার সাথে সাথে হযরত মাহবুবে ইয়াযদানী (রঃ) তার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, 'খোদা তায়ালার কাজের মধ্যে নাক গলানোর ধৃষ্টতা কোথায় পেলে! পরম দয়াময় প্রতিপালককে বুঝি বান্দাদের প্রতিপালন কার্য শেখাচ্ছ?'

এ কথা শুনেতো আমির তোঙ্গরকুলি নিতান্ত শরমিন্দা ও চিন্তিত হয়ে পড়লেন এবং তিন দিন যাবৎ হযরতের সামনে আসা হতে বিরত রইলেন। অবশেষে হযরত নূরুল আইনের শরণাপন্ন হয়ে হযরত মাহবুবে ইয়াযদানীর সামনে উপস্থিত হলেন এবং বারবার ক্ষমার আর্জি পেশ করতে লাগলেন। হযরত তাঁকে ক্ষমা করে দিলেন।

কারামতঃ-১৪ আগুনে পোড়া জখম সুস্থ হয় নিমিষে

হযরত মাহবুবে ইয়াযদানী (রঃ) হজ্বব্রতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে স্বীয় খানকা শরীফ হতে সঙ্গী সাথীদের নিয়ে বের হলেন। অতঃপর অযোধ্যায় এসে উপনীত হলেন এবং

হযরতের বিশিষ্ট খলীফা হযরত মৌলানা শামসুদ্দীন ছিদ্দিকী 'ফরিয়াদরস' (রঃ) এর খানকা শরীফে মেহমান হলেন। হযরত শামসুদ্দীন হযরত গাউসুল আলম (রঃ)কে পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং তাঁর সম্মানে প্রচুর আহার্যের ব্যবস্থা করলেন। এমনকি হযরত মাহবুবে ইয়াযদানী স্যুপ পছন্দ করেন বলে হযরত শামসুদ্দীন নিজ হাতে স্যুপ তৈরী করলেন। স্যুপ তৈরী করতে গিয়ে হযরত শামসুদ্দীন হাত পুড়ে ফেললেন এবং তাতে একখানা পট্টি বেঁধে আহার্য পরিবেশন করতে লাগলেন।

হযরত মাহবুবে ইয়াযদানী (রঃ) এর চোখে পড়ল তাঁর পট্টিবাঁধা হাত। তিনি এর কারণ জানতে চাইলে প্রত্যক্ষদর্শী কয়েকজন জানালেন যে, স্যুপ তৈরী করতে গিয়ে হাত পুড়েছে তাই কাপড়ের পট্টি বেঁধে রাখা হয়েছে। হযরত অতি মমতা ও স্নেহভরে শামসুদ্দীনকে লক্ষ্য করে বললেন, 'বৎস! কাছে এস। তোমার এ পোড়া দাগ নিয়ে চিন্তা করোনা, এটা তোমার বেলায়তেরই চিহ্ন।' অতঃপর তিনি সেখানে ফুঁক দিলেন দোয়া পড়ে এবং তৎক্ষণাৎ তা ভালো হয়ে গেল।

হযরত বলতেন, 'পীর ও মুর্শিদের সেবায় অবহেলাকারী কখনো অভীষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হতে পারবেনা। কেননা মুর্শিদের রাস্তায় যদি জীবন বাজি না করে তবে বুঝতে হবে সে ভীরু ও হিম্মতহীন। একটা জীবন নয় বরঞ্চ এক লাখ জীবনও যদি শেখ বা মুর্শিদের জন্য উৎসর্গ করা হয় তবুও তা যথেষ্ট নয়।'

হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ আলী হোসাইন আশরাফী জিলানী (রঃ) বলেন, "আমার মতে হযরত শামসুদ্দীন তেমনই ব্যক্তি যাঁর কাছে মুর্শিদের জন্য জীবন উৎসর্গ করাটাই সহজ ও স্বাভাবিক ছিল।"

কারামতঃ-১৫ ফজর হয়েও পিছিয়ে এল আবার রাত

হযরত মাহবুবে ইয়াযদানী (রঃ) এর নিয়ম ছিল এশার নামাজ ওয়াক্তের শেষ দিকে আদায় করা। কেননা বিনিদ্র রজনী এবাদতে মশগুল থাকতেন এবং বিভিন্ন নফল নামাজ ও অজিফা পাঠান্তে এশার নামাজ আদায় করতেন এবং এশার নামাজ শেষ করতে করতে তাহাজ্জুদের সময় হয়ে যেত। একবার পানি পথে হজ্বে যাওয়ার সময় এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটে। সেইবার পানি পথে যাওয়ার কালে পূর্ণ ছয়মাস জাহাজে থাকতে হয় তাঁকে।

সে সফরে একদিন জাহাজ সামুদ্রিক ঝড়ে পতিত হয়। তিনদিন তিন রাত প্রবল ঝড় অব্যাহত থাকে। হযরতের সফরসঙ্গীরা অত্যন্ত সন্ত্রস্ত ও চিন্তিত হয়ে দোয়া করতে লাগল। হযরত মাহবুবে ইয়াদানী (রঃ) নিজেও দোয়া দরুদে রত থাকেন। অবশেষে

ঝড় থামলে চতুর্থ রাত্রিতে হযরত নফল নামাজ সমূহ এবং অন্যান্য এবাদতসমূহ আদায় করতে করতে রাতের তিন চতুর্থাংশ কেটে যায়। অতঃপর হযরতের চোখে ঘুম নেমে আসে। কারণ ক্রমাগত তিন রাত তিন দিন একটুও ঘুমাননি এবং সামান্য পরিমাণও বিশ্রাম গ্রহণ করেন নি। তাই ঘুমের মধ্যে অজান্তে ফজর হয়ে এল। সুবহে সাদেকের ওয়াক্ত এসে উপস্থিত হলো এবং আকাশে লালিমা পরিদৃষ্ট হতে লাগল। এ সময় হযরতের নিদ্রা শেষ হয় এবং লোকেরা হযরতকে বলল যে, ভোর হয়েছে।

একথা শুনে হযরত মাহবুবে ইয়াযদানী (রঃ) বললেন, "আল্লাহ তায়ালা তাঁর ফকিরদের পরিশ্রমকে কখনো নষ্ট করেন না। তোমরা গিয়ে জাহাজের ছাদে উঠে দেখ, সম্ভবতঃ এখনো 'ফজর' হয়নি।" এ কথা শুনে সকলে উপরে উঠে দেখল, ঠিকই, রাতের অন্ধকারে চারদিক ঢেকে গেছে। এরপর হযরত উঠে অজু করে স্বাভাবিক নিয়মে এশার নামাজ আদায় করলেন এবং অন্যরাও হযরতের সঙ্গে তাদের নামাজ আদায় করে নিলেন। এরপর মাহবুবে ইয়াযদানী (রঃ) কিছুক্ষণ আরাম করলেন এবং এক ঘন্টা পর সোবহে সাদেক এর ওয়াক্ত হলো এবং যথানিয়মে হযরতের পিছে সকলে ফজর নামাজ আদায় করলেন।

এ দিন থেকে হযরত মাহবুবে ইয়াযদানী (রঃ) স্বীয় অনুচর ও মুরিদগণকে নির্দেশ দিলেন যেন আর কখনো এশার নামাজ বিলম্ব না করে। তিনি নিজেও এরপর থেকে আর বিলম্ব করতেন না।

সুবহানাল্লাহ! হযরত মাহবুবে ইয়াযদানীর কী শান! প্রকৃতপক্ষে সময়তো আল্লাহর অলিগণেরই তাবেদার হয়ে থাকে। সাধারণ লোকেরা তাঁদের সে শান ও ক্ষমতা অনুধাবন করতে পারেনা।

কারামতঃ -১৬ পিঁপড়ারাজের মেহমানদারী

শ্রীলংকার এক অঞ্চলে একদা সফর করতে গিয়ে হযরত মাহবুবে ইয়াযদানী (রঃ) এক গহীন জঙ্গলে গিয়ে পড়লেন। আশেপাশে কোন লোকালয় বা বসতির চিহ্ন দেখা যাচ্ছিলনা। তিন দিন যাবৎ তাঁরা কোন মানুষের দেখা পেলেন না, ফলে কোন খাদ্য সংগ্রহ করা গেলনা। এ অবস্থায় স্বাভাবিকভাবে সকলে ক্ষুৎ পিপাসায় কাতর হলেন। তাঁদের পা যেন আর চলতে চাইছিলনা। হযরত তাঁদের এ অবস্থা অনুভব করে একটি গাছের নিচে বিশ্রাম নিতে বললেন সবাইকে। কিছুক্ষণ পর তাঁরা দেখলেন একটি পিঁপড়া এদিকে এগিয়ে আসছে। ইদুঁরের সমান তার আকার। সেটি সোজা হযরত

মাহবুবে ইয়াযদানী (রঃ) সমীপে হাজির হলো এবং ইশারা ইঙ্গিতে কিছু যেন বলল। অতঃপর সেটি চলে গেল।

অনেকক্ষণ পর সেটিকে আবার আসতে দেখা গেল এবং পূর্বের ন্যায় হযরতের কাছে এগিয়ে গিয়ে তাঁকে কিছু বললে হযরত সঙ্গীদের উঠার নির্দেশ দিয়ে নিজেও পিঁপড়ার সাথে সামনে অগ্রসর হলেন। অনতিদূরেই একটি গাছের নিচে ছিল পিঁপড়াদের আবাস। সকলে সেখানে পৌছে হতবাক হয়ে গেলেন। তাঁদের জন্য চল্লিশটি মিষ্টজাত খাদ্যের স্তুপ সাজিয়ে রাখা হয়েছে। তন্মধ্যে একটির আকার কিছুটা বড় এবং অন্যগুলি সব সমান। হযরতকে বড়টির সামনে এবং অন্যদেরকে একটি করে স্তুপ নিয়ে বসানো হলো। অতঃপর সকলে পরিতৃপ্ত হয়ে তা আহার করলেন।

আহারাদির পর হযরত সঙ্গীদের নিয়ে নিজেদের অবস্থান অভিমুখে রওয়ানা হলে পিঁপড়াটিও সাথে সাথে চলতে লাগল এবং গন্তব্যস্থলে পৌছানো পর্যন্ত সে সাথে ছিল। তারপর হযরত তাকে বিদায় জানান। পিঁপড়া চলে যাওয়ার পর হযরত নূরুল আইন (রঃ) পিঁপড়া সম্পর্কে জানতে চাইলে হযরত জানান যে, এ পিঁপড়াটি তাদের মধ্যে রাজা। একদিন জনৈক ধনী আমীর বিপুল পরিমাণ খাদ্য সামগ্রী সাথে নিয়ে এ জঙ্গলে শিকার করতে এসেছিল। তারা ঐ স্থানে বসে বিশ্রাম ও আহারাদি করে। তাদের আনা বিপুল খাদ্য সামগ্রী উদ্বৃত্ত থেকে যায় এবং তা তারা এখানে পিঁপড়াদের ঢিবিতে ফেলে রেখে যায়। পিঁপড়ারাজ তখন সেগুলি হেফাজত করে রেখে দেয় এবং মনে মনে ভেবে রাখে যে, যদি কোন দিন সম্মানিত কোন অতিথির আগমন ঘটে তবে এ দিয়ে সে মেহমানদারী করবে। খোদাতায়ালা তাঁর ফকিরদের এ স্থানে পৌছালেন এবং পিঁপড়ার বাসনা পূরণ হলো।

হযরত গাউসে আলম (রঃ) এর অমূল্য বাণী হতে

● ইলম বিহীন পরহেজগার ব্যক্তি শয়তানের অনুগত হয়।

● আমলবিহীন আলেম হলো রাঙতা বিহীন আয়নার মতো। হযরত এর একটা চমৎকার উদাহরণ দিয়েছেন যে, কোন ব্যক্তি দশটি উৎকৃষ্ট মানের তলোয়ারসহ কোন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ একটি বাঘ সামনে পড়ল। এমতাবস্থায় হাতিয়ারগুলির (অস্ত্র) ব্যবহার ছাড়া লোকটি রক্ষা পাবেনা। তেমনি কোন লোক অপরিসীম পাণ্ডিত্য অর্জন করল কিন্তু আমল করা হতে বিরত রইলে সে কিছুতেই নাজাত লাভ করবেনা।

● যে ব্যক্তি বেমানান কোন স্থানে এলমের আলোচনা করে সে ব্যক্তির কথাবার্তার মাঝ হতে দুই অংশ 'নূর' নষ্ট হয়ে যায়।

● কেউ যখন জেনে যায় যে, সে মাত্র এক সপ্তাহের মতো বেঁচে থাকার সম্ভাবনা। তার উচিত 'ইলমে ফেকাহ' (শরীয়তের ব্যবহারিক জ্ঞান) চর্চায় মনোনিবেশ করা। কেননা দ্বীনি একটি মাসয়ালার জ্ঞান হাসিল করা এক হাজার রাকাত নামাজ হতে শ্রেয়।

● প্রত্যেক বুযর্গের কোন বাণী স্মরণ রাখতে চেস্টা করো। সেটা সম্ভব না হলে অন্তত পক্ষে তাঁদের নাম মনে রাখবে, তাতে যথেষ্ট উপকৃত হবে।

● কোন সুফী সাধককে দেখে যদি যাচাই করতে না পার তবে তাকে অপমান বা উপহাসযোগ্য মনে করো না কিংবা হেয় ভেব না।

● বাদশাহ ও শাসকদের সাথে দরবেশগণের যোগাযোগ করা উচিৎ এবং তাদেরকে সুন্দর উপায়ে সংশোধন করা অপরিহার্য।

● যখন কোন শহরে পৌছবে তখন সেখানকার বুযর্গগণের সাথে দেখা করবে এবং তারপর বুযর্গগণের মাজার সমূহ জেয়ারতে যাবে।

● 'মুতাওয়াক্কিল' (আল্লাহ্‌তে নির্ভরশীল) এর তিনটি চিহ্ন বিদ্যমান। প্রথমতঃ কারো কাছে কিছু চাইবেনা, দ্বিতীয়তঃ যা হস্তগত হয় তা ফেরত দেয়না এবং তৃতীয়তঃ এসব যা হাতে আসে সঞ্চয় করে রাখেনা।

● প্রকৃত মুতাওয়াক্কিল সেই, যার দৃষ্টি কার্যকারণের পরিবর্তে এর সৃষ্টিকর্তার উপর থাকে।

● ভয় ও ভরসার মধ্যেই ঈমান। এর উদাহরণ এতটুকু বুঝতে চেষ্টা কর যে, পক্ষীর দুইটি ডানার মধ্যে উভয়টির যতক্ষণ শক্তি না আসে ততক্ষণ যেমন সে উড়তে অক্ষম তেমনি ঈমানের ক্ষেত্রে ভয় ও ভরসা।

● আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক মুসলমানকে যেন কৃপণতা হতে রক্ষা করেন। কেননা এটা কাফেরগণেরই বৈশিষ্ট্য।

● যে ব্যক্তি 'রিয়াজত ও মুজাহাদাহ' (আধ্যাত্মিক সাধনা ও পরিশ্রম) না করবে, তার মধ্যে 'দৌলতে মোশাহাদা' (বাতেনী দৃষ্টি শক্তি) কখনো অর্জিত হবেনা।

● খোদার বন্ধু কখনো মুর্খ বা জাহেল হয় না।

● কাউকে হেয় দৃষ্টিতে দেখবেনা। কেননা এমন ব্যক্তিদের (যাদের দেখতে হেয়কর ধারনা করা হয়) মাঝেই খোদার বন্ধুদের অনেকে আত্মগোপন করে থাকেন।

● 'মুহিব' (প্রেমিক) মাহবুবের সত্বার মাঝে বিলীন হওয়ার নামই তাওহীদ।

● সৃষ্টির সেবা করা নফল পড়া হতে উত্তম।

● আহার তিন পর্যায়ের হয়ে থাকে। ফরজ, সুন্নাত ও মুবাহ। যে পরিমান মানুষকে জীবনাবসান হতে বাঁচাবে তা ফরজ, আর যে পরিমান আহার্য এবাদত ও স্বীয় পেশাগত শ্রমে প্রয়োজন তা সুন্নাত এবং পেটভরে আহার গ্রহণ করা মুবাহ।

● রাতের বেলা আহার কখনো ত্যাগ করবেনা, কেননা এতে দুর্বলতা ও বার্ধক্য সৃষ্টি হয়।

● জনৈক দরবেশ একদিন হযরতের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন, প্রত্যেকের জন্য, রিজিক' নির্দ্দিষ্ট থাকার পর তা অর্জনের জন্য ঘুরতে ফিরতে হয় কেন? হযরত উত্তরে বললেন, খোদা তায়ালাই যদি তাকে ঘুরান তাহলে আর প্রশ্ন কেন? অতঃপর হযরত আরো বললেন, তোমাদের নিকট সফর ও ঘুরাফিরায় কেবল রিজিক অর্জনটাই চোখে পড়ল! সফরে কত অসংখ্য ফায়েদা রয়েছে তাতো বলে শেষ করার নয়। কামেল অলিগণের জেয়ারত এবং তাঁদের নিকট হতে উপকৃত হওয়া, মাহাত্মপূর্ণ স্থান সমূহে উপস্থিতি এবং সেখান হতে 'ফয়েজ' হাসিল করা, আল্লাহর নিদর্শন সমূহ সম্পর্কে অবগত হওয়া এবং তার অপরিসীম কুদরত প্রত্যক্ষ করা ইত্যাদি কি নগণ্য বলে মনে

হয়? জেনে রেখো, এসব কারণে ফকির দরবেশগণ সফরের মনস্থ করে থাকেন; রুজি রোজগারের উদ্দেশ্যে নয়।

● রিজিকের জন্য অধিক পেরেশান হয়োনা এবং মৃত্যুর ব্যাপারে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়োনা। রিজিক বন্টনকৃত হয়েছে, যেভাবেই হোক তা হস্তগত হবেই। আর মৃত্যুর সময় নির্দ্দিষ্ট আছে, তার আগমন আবশ্যম্ভাবী।

● বুযর্গানে কেরামের জীবন বৃত্তান্ত ও জীবনাচার সম্পর্কে পড়া ও শুনার মাধ্যমে হেদায়ত লাভে আগ্রহীদের অন্তরে নূর সৃষ্টি হয়।

● কিছু লোকের ধারণা হলো ফকীর দরবেশদের জন্য বাদশাহ ও সর্দারদের সাথে মিলিত হওয়া উচিত নয় কিন্তু এ ধারণাকে আমি মূর্খতা ও দাম্ভিকতা প্রসূত বলেই ব্যাখ্যা করি। কেননা পূণ্যবানদের পূণ্য যেমন বদকারদের আমলনামায় লিখা হবে না তেমনি বদকারদের গুনাহও পূণ্যবানদের আমলনামায় লিখা হবেনা।

(তিনি আরো বলতেন) বাদশাহ ও বিচারকগণ হয়তো হবে ন্যায়পরায়ণ নতুবা যালিম বা অত্যাচারী। যদি ন্যায়পরায়ণ ও এবাদত গুজার হয় তবে তাদেরকে দেখলে সাওয়াব ও বরকত অর্জিত হয়। হুযুর সরওয়ারে কায়েনাত (দঃ) এর বাণী রয়েছে যে, হাশরের দিন খোদার সামনে ন্যায়বান নেতাই হবে সর্বোত্তম। হযরত আলী (রঃ) বলেছেন যে, এক ঘন্টার ন্যায়পরায়ণতা ষাট বছরের এবাদত থেকেও শ্রেয়তর। পক্ষান্তরে বাদশাহ বা বিচারক যদি যালিম অথবা ফাসেক হয় তবে আলেম ও পীর মশায়েখ উভয়ের উপর ফরজ হলো তাদের সাথে দেখা করে 'সত্যের আদেশ ও অসত্যের বারণ'- এর দিকে উদ্বুদ্ধ করা। আলেম ও পীরগণ ধন-সম্পদ হাসিলের উদ্দেশে তাদের কাছে যাবে না বরং সত্য দ্বীনের প্রতি পথ প্রদর্শন, সৎ কর্মের প্রতি উদ্দীপনা সৃষ্টিই হবে তাদের উদ্দেশ্য। এভাবে তাঁরা বাদশাহ প্রমুখ নেতৃস্থানীয়দের সত্যিকার কামালিয়াতের পানে পৌঁছাতে পারবে। ভয় পাবেন না, শাসকদের রূহানী পথের ঘাটতি কিংবা তাদের এবাদতের ত্রুটি-অপূর্ণতা কামেল দরবেশ ও সুফীর উপর কোন প্রভাব ফেলতে পারবে না।

● 'সুফীগণের দৃষ্টিতে তাহাজ্জুদ নামাজ হচ্ছে সর্বোত্তম এবাদত এবং শ্রেষ্ঠতম নফল। তাহাজ্জুদ নামাজ হলো আল্লাহ্র ভালবাসার চাবি স্বরূপ। এটা সিদ্দীকগণের চোখের নুর এবং ফরজ নামাজ সমূহ আদায় করতে গিয়ে যে ত্রুটি বিচ্যুতি হয়ে থাকে তা এ নামাজের মাধ্যমে প্রতিকার হয়। শুধু তাই নয়, এ তাহাজ্জুদ আরেফগণের রূহের উল্লাস এবং আবরারগণের জন্য কলবের আনন্দ স্বরূপ।

● (হযরত আরো বলেন) দ্বীনের ব্যাপারে আমার সকল প্রকার সৌভাগ্য এবং দোয়া কবুল হবার মর্যাদা নিয়মিত তাহাজ্জুদে অতিবাহিত করার বদৌলতেই অর্জিত হয়েছে।

এ মহান বুযর্গের বিশাল ও মাহাত্ম্যপূর্ণ কর্মজীবনের যৎ কিঞ্চিত পরিচিতির যে প্রতিফলন আলোচনায় সম্ভবপর হয়েছে তা তাঁর সম্পর্কে আরো জানার ও উপলব্ধির ঔৎসুক্য সৃষ্টি করে মাত্র। এর মাধ্যমে কারো প্রবল তৃষ্ণা মিটানো তাই সঙ্গত কারণেই সম্ভব নয়। বরঞ্চ আমরা সত্যিকার উপলব্ধির জন্য তাঁরই নুরানী ফুয়ুজাতের প্রত্যাশা নিয়ে রইলাম।